পুরাণের সাহায্য নিইনি, এখানে যদি কিছু ভুল থাকে তা আমার লেখার বা বোঝাপড়ার মধ্যে, কিন্তু গুরুদেবের বলার মধ্যে নয়।

দর্শনাচার্যের থেকে সৃষ্টি রহস্যের অনেক কিছুই শুনেছি ও জেনেছি কিন্তু যথা সময়ে তার দক্ষিণা দিতে পারিনি। যদি এই ক্ষুদ্র বইখানির দ্বারা আমাদের আপামর জনগণের কিছু উপকারে আসে সেটাই হবে আমার পরিশ্রমের বিনিময়ে পাওয়া গুরুদেবকে দেওয়া দক্ষিণা — এই-ই হবে আমার পরম প্রাপ্তি। দর্শনাচার্যের শুভাশীর্বাদ সবার উপর বর্ষিত হোক, এই শুভ কামনা জানিয়ে আমার নিবেদন শেষ করলাম।

বিনীত

লেখক

২২ কার্ত্তিক, ১৪১৪

জশাড়, কোলাঘাট

পূর্ব মেদিনীপুর

পিন - ৭২১১৩০

(ফোন নং - ২৬৫৪-৭৯০৯, ৯৭৩৪৮-১৫৪৫০)

যোগীবর ভীমানন্দ

যাঁর চিন্তাধারার রূপরেখা দিতে এই মুক্তির সোপান বইখানি লেখা তাঁর সম্বন্ধে অন্ততঃ দু'চার কথা না বলা হলে আমার প্রিয় পাঠকবর্গকে অনেকখানি অন্ধকারে রেখে দেওয়া হবে, অপর দিকে বইখানির গুরুত্বও যাবে বহুলাংশে কমে।

আজ থেকে প্রায় ৬০/৭০ বছর আগেকার কথা। অবিভক্ত মেদিনীপুরের এক ক্ষুদ্র জনপদ কোলাঘাট। প্রসিদ্ধি লাভ করেছে ইলিশ মাছ, কাঠ ও কয়লা ব্যবসার প্রধান কেন্দ্রস্থল হিসেবে। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে রূপনারায়ণ নদ, কখনো ধীর স্থির আবার কখনোও বড়ই চঞ্চল। তারই বুকে পাল তুলে ভেসে চলেছে ছোট বড় নৌকাগুলি এক এক করে দূর দূরান্তের পানে। নদীর তীরে শান্ত নিভৃত পল্লীর শীতল মনোরম পরিবেশে গড়ে উঠেছে এক আশ্রম, স্বামী সত্যানন্দ যোগাশ্রম—ভারপ্রাপ্ত সন্ন্যাসীর নাম ব্রহ্মানন্দ গিরি। আর, এরই অনতিদূরে গড়ে উঠেছে বেচারাম পাল ও ফেলুচরণ পালের টালি তৈরির কারখানা।

ঐ কারখানায় একেবারে ছেলেবেলা থেকেই কাজ করে চলেছেন স্থানীয় কুখাবাড় গ্রামের অতি দরিদ্র চাষিবাসি পরিবারের এক অশিক্ষিত কি অল্প শিক্ষিত যুবক নাম ভীমচন্দ্র গুড়ে। এক এক করে টালি ও মটকা গড়ার সমস্ত কাজই তিনি শিখে ফেলেছেন। এ ছাড়াও মনিবের বাড়ীর অনেক বাড়তি কাজও তাকে করে দিতে হয়। এখন যাবতীয় কাজই তার নখদর্পণে। নিজের কর্মদক্ষতা, বিশ্বস্ততা এবং আচার আচরণের গুণে সবাইয়ের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছেন, সবার কাছে পরিচিত হয়েছেন 'বাবাজী' নামে।

গতানুগতিকভাবে দিনের বেশীর ভাগ সময়টাই কেটে যায় টালিভাঁটির কাজে। তার পরেই যখন গ্রামের বুকে নেমে আসে সন্ধ্যা, মিলে যায় অখণ্ড অবসর। ছুটে আসেন পাশের আশ্রমে; শুরু করে দেন শরীর চর্চার পাশাপাশি আশ্রমের যাবতীয় কাজ, বরণ করে নেন আশ্রমের স্বামীজি ব্রহ্মানন্দজিকে গুরুরূপে।

সংসারে লোকজন বলতে আছেন এক বৃদ্ধা দিদিমা, নিজ স্ত্রী ও এক ছেলে পঞ্চু। বাবা মা গত হয়েছেন বহু দিন আগেই। জায়গা জমি বলতে কিছুই নেই, সম্বল শুধুমাত্র বাস্তুভিটেটুকুই, আর আছে এক দুধালো গাই। দুধ বিক্রীর সামান্য কিছু পয়সা আর নিজের যৎসামান্য আয়ে ছেলে পুলের

সংসারে দু'বেলা দু'মুঠো ভাত আর যোগাড় হচ্ছে না। অভাব অনটন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আশ্রমে মাঝে মধ্যে গঙ্গাসাগর ও কলকাতা যাবার পথে দু'চারজন সাধু-সন্ন্যাসী আসেন। তাদের নিজেদের মধ্যে অনেক সময়েই ঈশ্বর, ভগবান, বেদ, পুরাণ, গীতা, ধর্মাধর্ম প্রভৃতি নিয়ে অনেক আলোচনা হয় ঠিক কথাই, তবুও মনের মতো উত্তর খুঁজে পান না। সাধুদের মধ্যেও ঠিক-ঠিক বোঝাপড়া আছে বলে মনে হয় না। মনের ক্ষুধারও আর নিবৃত্তি হতে চায় না। মনের মধ্যে বাসনা হয়ে উঠেছে তীব্র যেমন করেই হোক জানতে হবে সৃষ্টি তত্ত্ব, ভাঙতে হবে এর রহস্য, মন হয়ে উঠেছে উতলা — কে তাকে বলে দেবে পথের সন্ধান?

প্রত্যেক দিনই কাজের শেষে নতুন করে আশা নিয়ে ছুটে আসেন আশ্রমে। শুরু করে দেন গুরু সেবা, আশ্রমের রান্নাবাড়া, গাছপালা লাগানো, বাসন মাজা, কাপড় কাচা ও অতিথি সেবা থেকে সব কিছুই। এইভাবে কেটে যায় দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, তবুও কোন বিরাম নেই, প্রতীক্ষারও নেই শেষ। অবশেষে আশ্রমের স্বামীজিই একদিন মুক্তিদাতা হিসাবে দেখা দেন। বলে দেন আসন ও কর্ম পদ্ধতি, লেগে যেতে বলেন জপ, ধ্যান ও ঈশ্বর সাধনায়। মিলে যায় পথের সন্ধান, শুরু হয়ে যায় নিরলস যোগ সাধনা।

একদিকে অর্ধাহার ও অনাহার অন্যদিকে সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনী ও রাতভোর যোগ সাধনা শরীরে সইলো না। শরীর রোগাক্রান্ত হলো না ঠিকই কিন্তু অল্প দিনেই ভেঙে গেল, শরীর হয়ে গেল জীর্ণ, শীর্ণ, শুষ্ক কাষ্ঠপ্রায়। কথা বলতে পারছেন না, চলতে পারছেন না, মালিক বকাঝকা করছেন, তবুও কি আশ্রম কি কারখানা কোথাও কাজের ছেদ দেননি। এতো দুঃখকষ্টের মধ্যেও ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়নি, প্রতীক্ষারও হয়নি শেষ। নতুন মনোবল নিয়ে নতুন উদ্যমে এগিয়ে গেছেন। এমনি করে জীবন যুদ্ধের দুরতিক্রম্য সোপানশ্রেণি পেরিয়ে গেছেন এক এক করে। অবশেষে এসে গেছেন বহু প্রতীক্ষিত পরম লগনটিতে —১৩৬৬ সালের ১৬ই শ্রাবণ শুক্রবার বেলা একটায়। তিনি পেয়েছেন সৃষ্টির আলো, পেয়েছেন ত্রিনয়ন, শুনেছেন এক দৈববাণী,—"ভারতের শ্রেষ্ঠ দর্শন যোগীরূপে একদিন প্রতিভাত হবে"।

এরপর এক এক করে কেটে গেছে জীবনের আরোও সুদীর্ঘ ২৭টি বছর। এই সময়ে করেছেন কেবল বোঝাপড়া আর বোঝাপড়া, বোঝাপড়া অজানা থেকে জানার, সৃষ্টির সাথে স্রষ্টের—কখন? কি? কেন? কি ভাবে? এরকম

বহুমুখী প্রশ্ন ও তার সঠিক উত্তর। অবশেষে ভেদ করেছেন সৃষ্টির অতি গোপন রহস্য, পেয়েছেন অফুরন্ত এক জ্ঞানের ভাণ্ডার।

শত শত সাধু সন্ন্যাসী ঘর সংসার ত্যাগ করে একাকী নির্জন গিরি কন্দরে গিয়ে জীবন ভোর কঠোর সাধন ভজন করেও যাঁকে জানতে পারেননি; বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে যাঁকে পাওয়া একান্ত দুর্লভ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, গৃহের মধ্যে নানা দুঃখ কষ্টে জর্জরিত থেকেও ইন্দ্রিয় সমূহকে যখন যেমনটির দরকার সেইরূপ বশে রেখে সাধারণ একজন মাহিষ্য পরিবারের গৃহী অশিক্ষিত দিনমজুর যোগ সাধনার সর্বোচ্চ শিখরে সৃষ্টির অতি নিগূঢ় রহস্য ভেদ করতে পারলেন—এটাই বোধ হয় সৃষ্টির সব থেকে বড় রহস্য।

তিনি নিজেকে জেনেছেন, পৃথিবীতে মনুষ্য সৃষ্টির কারণ জেনেছেন, অপরকেও তিনি তাই জানাতে চান, বাঁচাতে চান পৃথিবীর মানুষকে, ঘুচাতে চান মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব, ভেদাভেদ ও ভুল বোঝাবুঝি। এর জন্য বাহ্যিক উপদেশের ফুলঝুরি তিনি ছড়াতে চান না। তিনি সামান্য একজন কর্মী, দিনমজুর, তাঁর বাণী কর্মের বাণী, তাঁর পথ নিজে করে অপরকে করানোর পথ। নিজে খাওয়া ও অপরকে খাওয়ানো, নিজে সুখে থাকা ও অপরকে সুখী রাখার। এতেই ঘটবে পারস্পরিক মিল-মিলন, রচিত হবে বহু দিনের প্রতীক্ষিত যোগীগুরু নির্দেশিত পথে মুক্তির সোপান।

সিদ্ধিলাভ : ১৬ই শ্রাবণ, ১৩৬৬

আবির্ভাব : ১৪ই পৌষ, ১৩৩৩ সাল তিরোভাব : ১১ই আষাঢ়, ১৪০৯ সাল

দর্শনাচার্য যোগীবর ভীমানন্দ মহারাজ

সমর্পণ

দেশ বিদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বিশেষতঃ সহায় সম্বলহীন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দল, যারা প্রতিটি সংসারে অপাঙ্‌ক্তেয়, যারা হারিয়ে ফেলেছেন পরিবার পরিজন আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের ভালবাসা, যারা কাটাতে চলেছেন মাটির মায়া, এই পৃথিবীর রূপ রস আলো থেকে যারা চিরতরে বঞ্চিত হতে চলেছেন, যারা প্রত্যেকেই কমবেশী বার্ধক্যের ভাবনায়, শক্তিতে, মৃত্যুভয়ে সর্বদাই ভীত, শঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত — এইরূপ মৃত্যুপথযাত্রী প্রতিটি নরনারীর জীবন যন্ত্রণায় চির শান্তি, চির মুক্তির শুভকামনায় যোগীবর জ্ঞানকল্প ভীমানন্দ মহারাজজীর প্রদত্ত আশু করণীয় কর্তব্যকর্ম সমন্বিত এই ক্ষুদ্র বইখানি তাদেরকেই সমর্পণ করে দিলাম।

সূচিপত্র

অ
অধ্যাত্ম বিজ্ঞান কি? ১৯
অজপা নাম কি? ১৯
অবতার কে বা কারা? ২০
অভিশাপ দেওয়া উচিত না অনুচিত? ২১
আ
আগে রাম না আগে রামায়ণ? ২২
আগে পরে—গাছ না বীজ? ২২
আধ্যাত্মিক শিক্ষা ২৩
আধ্যাত্মিক শিক্ষা — অতীত ও বর্তমান ২৪
আত্মা ২৫
আত্মমর্যাদা ২৯
আমি কে? ৩০
ই
ইন্দ্রিয় কি ও কেন? ৩২
ইহলোক ও পরলোক — তফাৎ কোথায়? ৩৩
ঈ
সাকার ও নিরাকারে ঈশ্বর ৩৪
ঈশ্বর যদি থাকেন — দেখতে পাচ্ছি না কেন? ৩৪
ঈশ্বর আছেন — প্রমাণ কোথায়? ৩৫
ঈশ্বর না মানলে ক্ষতি কি? ৩৭
ঈশ্বরকে জানবো কেন? ৩৭
ঈশ্বরকে জানবো কীভাবে? ৩৮
ঈশ্বরের স্বরূপ ৩৯
ঈশ্বর থেকে মানুষ ৪০
ঈশ্বরের মনুষ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য ৪০
ঈশ্বর কোন কিছু সরাসরি ধরিয়ে দিচ্ছেন না কেন? ৪১
ঐ
ঐশ্বরিক শক্তি ৪২

ক
কর্মফল বাস্তবে কিছু আছে কি না? ৪২
কুল কুণ্ডলিনী কি? ৪৪
কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত হওয়ার লক্ষণ? ৪৫
গ
গুরুর দরকার কেন? ৪৬
গুরুর কাজ ৪৭
সৎগুরু কে? ৪৮
সৎগুরু চেনা যাবে কেমনে? ৪৮
সৎগুরু যদি না পাওয়া যায় আমাদের কি করা উচিত? ৫০
মানব জীবনের উপর গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব ৫১
গুরু ও শিষ্যে তফাৎ কোথায়? ৫২
চ
চাঁদের বুকে জল বৈজ্ঞানিক বনাম আধ্যাত্মিক মতবাদ ৫৩
চতুর কে? ৫৪
জ
জন্মান্তরবাদ ৫৪
জ্ঞান কি? ৫৬
জ্ঞানচক্ষু বা মনচক্ষু ৫৭
জ্ঞানচক্ষুতে সৃষ্টির আলো ৫৮
জ্ঞান ও বুদ্ধি ৫৮
ত
সাধন ভজনে ব্যবহৃত তিন-তিনের মিল ৫৯
ত্রিনয়ন ৬০
ত্রিগুণাতীত ৬১
ঠাণ্ডা তাপ কি ৬২
দ
মানবদেহ ৬২
মানবদেহের তিন গুণ ৬৩
যা আছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তা আছে দেহভাণ্ডে ৬৫
দেবভূমি — ভারতভূমি ৬৬
ভারতের বুকে এতো দেব দেবী কারণ কি? ৬৬
দীক্ষা ৬৭

ধ
ধ্যান ৬৯
ধর্ম কি? ৬৯
ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ৭০
পৃথিবীতে বহু ধর্ম লাভ কি? ৭১
ধর্মীয় অনুষ্ঠান সমূহের প্রয়োজনীয়তা ৭১
আইনস্টাইনের দৃষ্টিতে ধর্ম ৭২
ন
নিয়তি কি? ৭২
যুধিষ্ঠিরকে নরক দর্শন করতে হল কিন্তু কেন? ৭২
নিকৃষ্ট কে ও কি? ৭৩
নিদ্রা ও সমাধি তফাৎ কি? ৭৩
প
প্রাণবায়ু ৭৪
প্রাণায়াম কথাটির অর্থ কি? ৭৫
প্রাণায়াম সিদ্ধ বলতে কি বোঝায়? ৭৫
মূর্তি পূজা ৭৬
পূজা আচ্ছার আদৌ প্রয়োজন আছে কি? ৭৬
পাপ-পুণ্য তফাৎ কোথায়? ৭৮
পরমাত্মা ৭৯
প্রকৃতি ৮১
পৃথিবী কার প্রয়োজনে? ৮১
পৃথিবীর ওজন ৮২
ব
ব্যতিক্রম বন্ধু ৮২
বড় কে — ব্যক্তি না যুক্তি ৮৩
বাক্ সংযম ৮৪
ব্রহ্মচর্য ৮৪
বায়ুশূন্য অবস্থায় কোনও মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব কিনা? ৮৫
ব্রহ্মজ্ঞ ৮৬
নারীদের পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব কি না? ৮৭
অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখানো ৮৮

মানুষের ভিন্নমুখী বুদ্ধিবৃত্তি — কারণ কি? ৮৮
সবার মূলে বীজ ৮৯
বিজ্ঞানের প্রভাব যতই বাড়বে ধর্মের প্রভাব ততই কমবে—কথাটি ঠিক কিনা? ৯০
বিজ্ঞান এবং ধর্ম — তফাৎ কোথায়? ৯০
বিজ্ঞান এবং ধর্ম — সহাবস্থান সম্ভব কি না? ৯১
বার্ধক্যের ভাবনা নিরসনে ৯২
বিদ্যা ও বুদ্ধি — পার্থক্য কোথায়? ৯৩
ভ
ভক্তি ৯৩
ভক্তিতে ভগবান ৯৩
ভগবান আছেন বিশ্বাসে আসবে কীভাবে? ৯৫
ভগবানে ডেকে লাভ কি? ৯৫
ভগবান যদি ভালো চান তাহলে খারাপটা রেখেছেন কেন? ৯৬
ভাগ্য ৯৮
মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য গড়ে নিতে পারে — ঠিক কিনা? ৯৯
ভুল ১০০
ভুলের সাজা ১০০
ভয়ের কারণ ১০১
মৃত্যুভয় /মহাভয় কাটাতে ১০২
ভূত প্রেত পিশাচ বাস্তবে আছে কিনা? ১০৫
ম
মন ১০৭
মনের কাজ ১০৮
মন স্থির করার উপায় ১০৯
মেরু ১১০
মৃত্যু ১১১
মানুষ পারে না, মানুষের তৈরি যন্ত্র পারে — কারণ কি?১১২
মা - কে? ১১২
মানুষের পক্ষে যন্ত্রপাতি ছাড়া যেখানে সেখানে যাওয়া কি সম্ভব? ১১৩
অর্জুনকে যোগীদের সাথে তুলনা করা যেতে পারে কি? ১১৩
রামায়ণ মহাভারতের যুদ্ধ বাস্তবে ঘটেছিল কি? ১১৩
রাশির কাজ ১১৪

শ
শিক্ষার দরকার কেন? ১১৫
শক্তি ১১৫
মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব কেন? ১১৭
ষট্‌ চক্র ভেদে ঈশ্বর দর্শন ১১৭
মূলাধার থেকে সহস্রা ১২০
স
সূর্যের আলো — উৎপত্তি কোথা থেকে? ১২৩
স্বর্গ ১২৪
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ১২৪
যুধিষ্ঠির একা স্বর্গে যেতে পারলেন — কারণ কি? ১২৫
ঈশ্বর সাধনা কি? ১২৬
যোগ সাধনা কি? ১২৬
যোগিক সাধন শিক্ষা ১২৭
সাধু কে? ১২৯
সাধু ও বিজ্ঞানী—তফাৎ কোথায়? ১২৯
সাধকের আচরণ ১৩০
সাধুদের লোকালয়ে থাকা উচিত নয়—কারণ কি? ১৩১
সাধুরা প্রয়োজনে নিজ দেহে অন্যের রোগ নিতে পারেন—ঠিক কিনা? ১৩১
নারীদের যৌগিক ক্রিয়া কর্মাদি করা উচিত কিনা? ১৩২
যৌগিক ব্যাখ্যায় সমুদ্র মন্থন ১৩২
সর্বজ্ঞ ১৩৪
সঙ্গগুণ ১৩৫
মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ সফলতা ১৩৬

অধ্যাত্ম বিজ্ঞান কি?

অধ্যাত্ম বিজ্ঞান এমনি এক বিশেষ বিজ্ঞান যা সাধারণ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যের বাইরের জিনিসকেও ধরিয়ে দেয়। এই বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আমরা যুক্তিগ্রাহ্যের বাইরের স্থায়ী-অস্থায়ী, সঠিক-বেঠিক, উচিত-অনুচিত, ইহলোক-পরলোক, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ ইত্যাদির খবরাখবর জানতে পারি।

এই বিজ্ঞানকে ধরার কাজে আজ পর্যন্ত একটি মাত্রই যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। সব থেকে মজার ব্যাপার এই ব্যতিক্রম যন্ত্রটি ছোট বড়, ধনী দরিদ্র, রাজা প্রজা, রোগী ভোগী, ছাত্র শিক্ষক, সাধু গৃহী প্রত্যেক নরনারীর কাছে আছে। এই বিশেষ যন্ত্রটি আমরা সবাই ব্যবহারেও সক্ষম। কিন্তু আমরা কেহই জানি না। এই যন্ত্রটি হল নিজ নিজ মানবদেহ বা মানবশরীর, তা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই বিজ্ঞান সাধনার কাজে মানবদেহের ৫টি জ্ঞানেন্দ্রিয়, ৫টি কর্মেন্দ্রিয় এবং ৪টি অন্তরিন্দ্রিয় এই ১৪টি ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটিকে কাজে লাগাতে হয়। ঐ ইন্দ্রিয় সমূহকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে আমরা জীবকুল এর আগে কোথায় ছিলাম? এই পৃথিবীতে কেন এলাম? এখানে কিভাবে এলাম? আমাদের সৃষ্টির মূলে কে বা কি? মৃত্যুতেই জীবনের সব শেষ বা চরম পরিণতি কিনা? এ'রকম বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর পেতে পারি, জানতে পারি সৃষ্টি রহস্যের মূলে থাকা ঈশ্বর সদৃশ জিনিস ও তার বাস্তবতাকে।

অজপা নাম — কি?

সৃষ্টির শুরু থেকে ঈশ্বরীয় নাম গান জপ ও চর্চা সাধন-ভজনের বর্ণমালা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে এসেছে। অজপা নাম বিশেষ কোনও নাম নয়, পরন্তু এমনি এক নাম যা যথাবিধি জপ না করে অথবা বিনা আয়াসে আমাদের অন্তর থেকে নিশ্বাস-প্রশ্বাসে আপনা আপনি বাহির হতে থাকে বা বের হয়। কিন্তু অজপা নামেরও মূলে আছে দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি, চর্চা ও অভ্যাস। অজপা নাম ঈশ্বরাভিমুখী নাম, ঈশ্বর সমীপে পৌঁছে যাবার নাম।

বিরামবিহীন ভাবে গুরুর দেয়া যে কোনও নাম ভক্তি এবং নিষ্ঠা সহকারে অভ্যাসের ফলে এর গুণ মানবশরীরে রক্তের সাথে সহজে মিশে যায়। তখন মানব শরীরে অনাহত (যোগশাস্ত্র ও তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্রান্তর্গত ৪র্থ চক্র) নামক স্থানে উদ্ভূত হয় বিশেষ দুন্দুভির নিনাদ, নাম নাদ বা ওঁ-কার ধ্বনি। কালক্রমে মৌমাছির সুমধুর গুনগুন গুঞ্জন ধ্বনির ন্যায় ঐ ধ্বনি নিশ্বাসের সাথে Automatically দেহের ভিতর থেকে বাহিরে আসতে থাকে।

কিন্তু এই মোহময় মৃদুধ্বনি সাধক নিজে ছাড়া অপরাপর কেহ শুনতে পায় না। হরিণ যেমন নিজ মৃগনাভির সুমধুর গন্ধে আত্মহারা হয়ে জ্ঞানশূন্য অবস্থায় দিগ্বিদিকে ছুটে বেড়ায়, একজন সাধকের বেলাতেও অনুরূপ জিনিসটি ঘটে থাকে। এই মৃদু মধুর ওঁ-কার ধ্বনি অহরহ শ্রবণে সাধকের সাধন ভজনে মাদকতা জন্মে, জন্মে ভোগ বাসনায় অনাসক্তি। সাধক কামনা বাসনা, লোভ লালসা, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, আহার নিদ্রা যাবতীয় সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে সাধন ভজনের নেশায় মাতোয়ারা হয়ে যায়।

হিন্দু সম্প্রদায় ছাড়াও পৃথিবীর সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কাছে নিজ নিজ ভাষায় ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম গান জপ স্মরন মনন চিন্তন ও প্রার্থনার প্রচলন আছে। কিন্তু একমাত্র গৌরাঙ্গদেব প্রচারিত ১৬ নাম ৩২ অক্ষরযুক্ত 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম'—নাম জপে অতি দ্রুত এবং সব থেকে বেশী কাজ পাওয়া যায়। যেহেতু, ঐ নাম প্রকৃতি, পৃথিবী এবং মানবদেহ এই তিনের সাথে মিল করে তৈরি।

কিন্তু কেবলমাত্র নাম জপের মাধ্যমে ক্ষেত্র প্রস্তুতি, দুএকবার বড় জোর ঈশ্বর দর্শনও হতে পারে, তার বেশী অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাদি তথা সৃষ্টির গোপন রহস্য জানা যাবে না। এর জন্য ক্ষেত্রে উপযুক্ত বীজ হিসাবে সাধন ভজন এবং যৌগিক ক্রিয়া কৌশল—প্রাণায়ামের পথ অতি অবশ্য অবলম্বন করে চলতে হয়।

ধৈর্য, নিষ্ঠা, কষ্ট সহিষ্ণুতা, দৃঢ় আস্থা ও আত্মপ্রত্যয় এবং কঠোর অধ্যবসায়ের সাথে সাথে সৎকর্ম সৎচিন্তা সৎসঙ্গ ন্যায় নীতিবোধ আহার নিদ্রা কথা বলা সমস্ত কিছুতে সংযত ও সুশৃঙ্খল আচরণ সমস্ত জীবের মঙ্গল কামনা, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ব্যাকুলতা নাম গান জপে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে থাকে। আধ্যাত্মিকতার পথে চলতে গেলে এ'সবের দরকার খুব বেশী এবং সবার আগে।

অবতার কে বা কারা ?

অবতার শব্দটি অবতরণ অর্থাৎ ঊর্ধ্ব হইতে নিম্নে নেমে আসা থেকে এসেছে। এখানে ঊর্ধ্ব অর্থে শক্তির বিচারে অধিক এবং নিম্ন অর্থে অপেক্ষাকৃত কম শক্তিধরদের বোঝাতে চাওয়া হয়েছে। ভগবান দেবদেবী অবতার মহাপুরুষ সব একই মূলশক্তি ঈশ্বর তথা পরমাত্মার অন্তর্গত। শক্তির তারতম্য হিসাবে কেবল আলাদা আলাদা নাম, ঠিক ঢোঁড়া কি হেলে আর কেউটে মূলতঃ সাপ, কেবল অতিবিষ আর কমবিষ এই তফাৎ।

সত্যযুগে স্বয়ং সত্যনারায়ণরূপে ছিলেন শ্রীহরি বিষ্ণু ক্ষীরসাগরে অনন্ত শয্যায় শায়িত। পরবর্তী সময় অর্থাৎ ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি এই তিন যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে মানবদেহ নিয়ে জন্ম নিয়েছেন যথাক্রমে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্যদেব। এই তিনজনকে আমরা নরলোকে অবতাররূপে পেয়েছি। কেননা, এরা প্রত্যেকেই মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন, জন্মলগ্নে কেহই কাঁদেননি, কাউকে সাধন ভজন করতে হয়নি, জন্ম থেকেই নিজেদের স্বরূপ জানতেন—জন্মসিদ্ধ।

এই তিন অবতার বিশেষ বিশেষ গুণের অধিকারী ছিলেন। প্রত্যেকেই দুষ্টের দমন করে শিষ্টের পালন করার বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। পরমসত্ত্বার মূল শক্তির সহযোগে স্বয়ং কৃষ্ণ অভূতপূর্ব এক শক্তি নিয়ে পৃথিবীতে ধর্ম সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে, রামচন্দ্র নরনারায়ণরূপে ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূরণে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবানরূপে এবং প্রেমের অবতার গৌরাঙ্গদেব কৃষ্ণভাবে আত্মহারা হয়ে কলির জীব উদ্ধারে আবির্ভূত হয়েছেন।

অভিশাপ দেওয়া — উচিত না অনুচিত?

অভিশাপ বা অভিসম্পাত করা রাগের বাহ্যিক প্রকাশ। আমরা যখন একজন অন্যের কথাবার্তা বা আচার আচরণে ব্যথা পাই অথবা পেয়ে থাকি, বিশেষ করে আমাদের স্বার্থে যখন কেহ আঘাত হানে বা করে থাকে, তখনি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে অভিসম্পাত বা শাপ-শাপান্ত দিয়ে থাকি। অনেক সময় তার শাস্তির জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই। তাকে জাহান্নামে অর্থাৎ চির যন্ত্রণার রাজ্যে পাঠানোর জন্য আল্লাহের কাছে কৃপাভিক্ষা করি। এ'সবের মূল উদ্দেশ্য থাকে তাকে ক্ষতিতে ফেলে দেওয়া।

কিন্তু এ'সব করা মোটেই সঙ্গত বা যুক্তিযুক্ত নয়, কেননা —

১। সত্যিকারের অপরাধীকে অনেক সময় সঠিকভাবে চিহ্নিত করা নিজের পক্ষে সম্ভব হয় না।

২। জ্ঞানী গুণী বিশেষতঃ সজ্জনদের শাপ-শাপান্তের বা মনস্তাপের ফল অনেক সময় ফলে যায়, পরিণাম ভয়াবহ হতে পারে। অন্ধমুনির অভিশাপে রাজা দশরথ পুত্র শোকে প্রাণ হারিয়েছেন, গৌতম মুনির অভিশাপে অহল্যা পাষাণ হয়েছেন— রামায়ণ ও মহাভারতে এ'রূপ বহু নজির আছে।

৩। বিচারে ভুল হয়ে থাকলে শাপ-শাপান্তের ফল অনেক সময় নিজেকে ভোগ বা বহন করতে হতে পারে।

৪। সর্বোপরি, যে কোনও অপরাধে বা গর্হিত কর্মের সাজা সৃষ্টির নিয়মের

মধ্যে ধরা আছে, যেখানে ভাল এবং খারাপ কাজের ফলাফলে যোগ বিয়োগ বা কাটাকাটি হয় না। সেখানে সব কাজে আছে সূক্ষ্ম বিচার। এখানে যেমন ভাল কাজে আছে পুরস্কার, তেমনি কু-কর্ম বা মন্দ কাজে আছে তিরস্কার তথা সাজার যথাযথ ব্যবস্থাদি। এখানে মানুষ মানুষকে সাজা না দিলেও বা মানুষের হাত থেকে নিস্তার অথবা রেহাই পেলেও ঈশ্বরীয় নিয়মের কাছে পরিত্রাণ পাবার কারো কোন উপায় নেই।

প্রকৃত জ্ঞানীরা উচিত-অনুচিত, ঠিক-বেঠিক এ'সবের সমস্ত কিছু বোঝেন, সেই কারণে শত্রুরও অমঙ্গল কামনা করেন না। এখানে আমাদের উচিত অপরাধী বা দোষীর সুমতির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানানো। এতে উভয় পক্ষের লাভ ছাড়া ক্ষতির বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। যীশুখ্রিষ্ট নিজে ক্রুশে বিদ্ধ হয়েও অভিশাপ দেওয়া বা ভগবানের কাছে শাস্তির প্রার্থনা জানাননি। পরন্তু, পরম পিতার কাছে দোষীদের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা প্রার্থনা করেছেন। এই মহৎ গুণে মৃত্যুর দু'হাজারের বেশী সময় পরেও প্রভু যীশু দেশ বিদেশে পূজিত, তিনিই হয়েছেন জয়ী, হয়েছেন আজও বিশ্ব বন্দিত।

আগে রাম না আগে রামায়ণ?

রামচন্দ্রের জন্মের বহু আগে মহামুনি বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেছিলেন কথাটি সম্পূর্ণ সত্য। তবে কদাচিৎ কালে-ভদ্রে দু'একজন দুর্লভ ব্যক্তিত্বের পক্ষে এ'রূপ ব্যতিক্রম জিনিস বা ঘটনা আগাম বর্ণনা দেওয়া বা বাস্তবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। এর জন্য নির্দিষ্ট পথ ধরে এগোতে হয়, বাড়াতে হয় বোঝাপড়ার কৌশল। সাধন ভজনের বিশেষ কৌশলে ঐ বোঝাপড়া বা দূরদৃষ্টির ক্ষমতা বাড়িয়ে নেওয়া সম্ভব।

পৃথিবীর বুকে যে সব বিশেষ বিশেষ ঘটনা একদিন ঘটে গেছে অথবা আগামী দিনে ঘটতে পারে তা মহাশূন্যে পরিব্যাপ্ত ইথার তরঙ্গে আজও ধরা আছে। সাধন ভজনে ষট্‌চক্রভেদে ঐ সমূহ ঘটনা ধরা সম্ভব হয়। রত্নাকর প্রথম জীবনে দস্যুবৃত্তি করতেন। পরবর্তীকালে কঠোর তপস্যা ও নাম জপের একাগ্রতায় বাল্মীকি মুনিরূপে ঐ বোঝাপড়া ও দূরদৃষ্টির ক্ষমতা অর্জন ও বাড়িয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেই সুবাদে তার পক্ষে রামায়ণ কাহিনী আগাম বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

আগে পরে—গাছ না বীজ?

আমরা অনেক সময় তর্ক করি, যুক্তি টেনে আনি—কোনটি আগে, গাছ নতুবা বীজ? আবার অনেক সময় কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে প্রশ্ন রাখি

—মুরগি বা ডিম কোনটি আগে? এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক পৃথিবীর বুকে আবহমানকাল ধরে চলে এসেছে কিন্তু সঠিক উত্তর মেলেনি, কাজেই সন্দেহ কাটেনি। একমাত্র সৃষ্টির রহস্য ভেদ করতে পারলে এর সঠিক উত্তর জানা সম্ভব হয়, নতুবা নয়। তখনি জানা যায়,—পৃথিবীর বুকে আগে গাছ অথবা মুরগির জন্ম হয়েছে এবং তা থেকে যথাক্রমে বীজ এবং ডিম। ক্রমান্বয়ে এইভাবে গাছ থেকে বীজ আবার বীজ থেকে গাছ চলে এসেছে। কিন্তু সবার মূলে ছিল বা আছে একটিমাত্র জিনিস, যেটি হল প্রাকৃতিক শক্তি।

আধ্যাত্মিক শিক্ষা

আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রত্যক্ষ উপলব্ধিগত, বিজ্ঞান ভিত্তিক এক অতি বাস্তব শিক্ষা। গুরু-শিষ্য পরম্পরার এই বিশেষ শিক্ষার সহযোগে আমরা আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাধারণ ক্ষমতার বাইরের সমস্ত কিছুর গুণাবলী ও রীতিনীতি সম্পর্কে পাকাপোক্ত কি শক্ত সমর্থ ধারণা করে নিতে পারি। ক্রমান্বয়ে কাটিয়ে উঠতে পারি ভুল ধারণা সমূহ, অবগত হতে পারি যে সময়ে যে জিনিসটি গড়ে তোলার দরকার ঠিক সেই সময়ে সেই সুনির্দিষ্ট জিনিসটি।

আধ্যাত্মিক শিক্ষা অন্তর বিকশিত করার এক বিশেষ শিক্ষা, —দরকার বদ্ধ ধারণাসমূহ কাটিয়ে সত্যিকারের ধারণা গড়ে তোলার জন্য। আধ্যাত্মিক শিক্ষা এমনি এক বিশেষ শিক্ষা যা মৃত্যুর পরেও বিশেষভাবে কাজে লাগে। আমাদের এই প্রথাগত পুঁথি শিক্ষা পার্থিব জগতের সম্পদ সুখ বহন করে থাকে কি এনে দেয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক শিক্ষার দ্বারা আমরা অপার্থিব অর্থাৎ পৃথিবীর বাইরের জগতের সম্পদ আহরণ করতে পারি, পেতে পারি মানসিক সুখ সমৃদ্ধিতে ভরা উন্নততর জীবন।

আধ্যাত্মিক শিক্ষা 'আত্ম' অর্থাৎ নিজ তথা 'আমি'কে জানার মধ্য দিয়ে বিশ্বলোকের 'আমি'কে জানার মানুষ্য জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা। এই শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারলে অন্য সমস্ত রকম শিক্ষাও ম্লান হয়ে যায়। এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য প্রাকৃতিক শক্তির সমস্ত রকম বাধা বিপত্তি কাটিয়ে ওঠা, প্রাকৃতিক শক্তিকে জয় করে অপ্রকৃত জ্ঞান লাভ করা।

আধ্যাত্মিক শিক্ষার দরকার প্রকৃতির সত্য নিয়মকে জানার জন্য, যে নিয়ম সবার কাছে সমান। আমরা এখন যে শিক্ষা গ্রহণ করে চলেছি সেখানে সমাজকে এগিয়ে দেবার উপর জোর দেওয়া হয়েছে খুব বেশী কিন্তু সমাজকে ধরে রাখার জন্য যে বিশেষ শিক্ষার দরকার তার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে

না। পুঁথিগত শিক্ষায় মানুষের অভাব দূর হয়, আধ্যাত্মিক শিক্ষার দ্বারা মানুষের মনের অশান্তি দূর হয়, এটাই এখনও বোধে আসেনি।

এছাড়াও প্রতিটি শিশুর ভেতর যে পূর্ণতা বিরাজমান তা জাগিয়ে তোলার জন্য দরকার অন্যান্য শিক্ষার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক শিক্ষার। আধ্যাত্মিক শিক্ষার সহযোগেই একজনের মানসিক, শারীরিক, আত্মিক, বৌদ্ধিক ও সামাজিক বিকাশ ঘটানো সম্ভব, এই শিক্ষার দ্বারাই মানুষের হুঁশ জাগিয়ে তোলা সম্ভব। আরো সম্ভব একজনের চিত্ত শুদ্ধির। একমাত্র আধ্যাত্মিক শিক্ষার সহযোগেই নিজের ছাড়িয়ে অপরের চৈতন্য সত্ত্বাকেও জাগিয়ে তোলা সম্ভব হয়।

আধ্যাত্মিক শিক্ষা এমন এক বিশেষ শিক্ষা যার দ্বারা আমরা জানতে পারি নিজেকে, জানতে পারি পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মানোর কারণকে, জানতে পারি নিজ নিজ কর্তব্য কর্মকে। এর দ্বারা আরো জানতে পারি আমরা খাওয়া পরা বসবাস স্বাস্থ্য শিক্ষার মতো কোন্ কোন্ জায়গায় সবাই এক এবং অন্য কোথায় আলাদা আলাদা থেকেও কিভাবে এক? একমাত্র এখানেই জানা যায়, এই শিক্ষার সাথে অন্য শিক্ষার তফাৎ কতখানি ও কোথায়? মানবজীবনে এর প্রয়োজন কেন? বা এর বিশেষ প্রতিফলন কি? ইত্যাদি।

আধ্যাত্মিক শিক্ষা — অতীত ও বর্তমান

আমাদের সমাজ ও সামাজিক জীবনধারাকে সমস্ত রকম প্রতিকূলতা এবং বাধা-বিঘ্ন থেকে উপরে তুলে বা ধরে রাখার জন্য ভারতীয় আর্য ঋষিগণ আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রসার ও প্রচারে প্রথম ব্রতী হন। তারাই নিয়েছিলেন উদ্যোগ, তারা বুঝেছিলেন— প্রতিটি মানুষের ভেতর মনরূপী যে ঐশ্বরিক সত্ত্বার ছোঁয়াচ বর্তমান তারে ঐ শিক্ষায় শিক্ষিত করে জাগাতে পারলে একে অন্যকে চিনবে, জানবে ও বুঝবে, ভুলে যাবে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও বিদ্বেষ, দূর হবে ভুল বোঝাবুঝি ও বিভেদের, অবসান হবে মারামারি, হানাহানি ও কাটাকাটির। এই কারণে আর্য মুনি ঋষিগণ নিজ নিজ আশ্রম বা বাড়ীতেই পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রবর্তন করেছিলেন গুরুগৃহে থেকে গুরুমুখী এই আধ্যাত্মিক শিক্ষার।

অতীতে রাজা দশরথের পুত্রগণ সূর্যবংশের কুলগুরু মুনি বশিষ্ঠের কাছে বেদ পাঠাভ্যাস করেছেন। আচার্য দ্রোণ কৌরব ও পাণ্ডবদের অস্ত্র শিক্ষার দায়িত্বে রত থেকেছেন। কৃষ্ণ ও বলরাম শিক্ষাগ্রহণ করেছেন সন্দীপন মুনির পুত্র সান্দীপনি মুনির আশ্রমে থেকে, ধৌম্যঋষির আশ্রমে অধ্যয়নে রত আরুণির গুরুভক্তির উপাখ্যান আজও আমাদের পুরাণাদিতে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে।

আজ পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে পৃথিবীর বুক থেকে এক এক করে বহু জিনিষ লোপ পেয়ে গেছে। অনুরূপভাবে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আধ্যাত্মিক শিক্ষাও আজ লোপ পেতে বসেছে। সমাজের সর্বত্রই আজ ঘটেছে এর ব্যাপক প্রতিফলন, আজ বিশ্বের সর্বত্রই অস্থিরতা আর অরাজকতা। গাছপালা, পশুপাখী প্রভৃতিকে অক্লেশে ধ্বংস করার ন্যায় আজ মানুষ মানুষকেই অনায়াসে ধ্বংস করার উন্মত্ত এক নেশায় মেতে উঠেছে। সমস্ত মনুষ্য জাতিই আজ বিপন্ন। এইভাবে চলতে থাকলে আমাদের পতন অনিবার্য, ধ্বংস অবধারিত ও অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের সাধককুল মুনি ঋষিরাই একদিন ছিলেন এই শিক্ষার ধারক ও বাহক। আজকের সমাজে প্রকৃত পথ পদর্শকের বড়ই অভাব, তার বড় কারণ আজকের সমাজের যারা সাধু ঋষি বা সাধক সম্প্রদায় তাদের জীবন ধারণের বা বেঁচে থাকার পর্যাপ্ত সহায় সম্পদ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় নেই। অতীতে রাজা মহারাজারা এই ব্যয়ভার বহন করতেন। আজ রাজতন্ত্র লোপ পেয়েছে, পরিবর্তে এসেছে গণতন্ত্র। কিন্তু এরা আজ উপেক্ষিত, রাষ্ট্র এদের তথা এদের প্রতিষ্ঠান বা আশ্রম সমূহের ব্যয়ভার বহন করতে অপারাগ। ফলে আজকের সাধক সম্প্রদায় জনগণের দান ও দয়াদাক্ষিণ্যের উপর অনেকটাই নির্ভরশীল, আর এখানেই ঘটেছে বিপত্তি। মানবদেহ কাঠামোগত চাওয়া-পাওয়ার গুনেই সাধক সম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশ নিজেদের বাঁচা এবং নিজেদের প্রতিষ্ঠান সমূহের বিত্তবৈভব বাড়ানোর তাগিদে ছলা-কলার আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছেন। নিজেদের আশ্রম চালানোর বিভিন্ন অজুহাতে ভক্ত শিষ্য শিষ্যাদের দুর্বলতার সুযোগগুলিকে লাগাচ্ছেন বহুমুখী কাজে, তাদেরকে প্রলুব্ধ করে চলেছেন নানাভাবে। ফলে একদিকে যেমন সাধক সম্প্রদায় তাদের প্রকৃত কর্তব্য কর্ম থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন অপরদিকে জনগণও এদের উপর আস্থা রাখতে পারছেন না, দিনে দিনে ভরসা হারিয়ে ফেলছেন। মানবজীবনে এই শিক্ষা গ্রহণ করা কষ্টকর হলেও কীভাবে রপ্ত করা যায়? এর সুবিধার দিকগুলি কি কি ও কতখানি? বিশেষ করে মৃত্যুর পরেও কীভাবে কাজে লাগে? —এ'সব নিখুঁতভাবে তুলে ধরার মতো লোক আজ সাধু ঋষিদের মধ্যেও বিরল, বড় অভাব—ফলে আজ এই বিচ্যুতি।

আত্মা

আত্ম অর্থাৎ নিজেকে জানলে আত্মাকে জানা যায়, আত্মোপলব্ধি ঘটে। আত্মোপলব্ধিতে জানা যায় পরমাত্মা সৃষ্টি করেছেন প্রকৃতির। এই প্রাকৃতিক

শক্তি থেকে আমরা জীবাত্মার মধ্য দিয়ে জীবরূপে পৃথিবীর বুকে প্রাণ পেয়েছি। অর্থাৎ পরমাত্মা থেকে প্রকৃতি এবং তা থেকে জীবাত্মা হয়ে জীবকুলের শ্রেষ্ঠ জীব আমরা হুঁশ যুক্ত মানুষ। এই জীবের আত্মা জীবাত্মাই আমাদের সাধারণের কাছে আত্মা নামে সমধিক খ্যাত। বিভিন্ন দেবদেবী, অবতার এবং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মহাপুরুষেরা পরমসত্ত্বার মূল শক্তি থেকে সরাসরি ধরাধামে আসেন, এদেরকে প্রকৃতির মাধ্যমে আসতে হয় না। এদের আত্মাসমূহ সাধারণের থেকে উন্নতমানের শুদ্ধ আত্মা। অপরদিকে মশা মাছি কৃমি ফড়িং প্রজাপতি প্রভৃতি কীট-প্রতঙ্গের কোনও আত্মা নেই। এরা আমাদের পা দু'টির দ্বারা মানবদেহ কাঠামোটিকে ধরে রাখার ন্যায় প্রাণীকুলের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার কাঠামোটিকে ধরে রেখেছে মাত্র।

আমাদের প্রতিটি মানবদেহে মন নামক বস্তুটিতে থাকে আত্মার ছোঁয়াচ বা স্পর্শ। মন আবার প্রাণবায়ুর উপর ভাসমান। কাজেই শরীর অভ্যন্তরস্থিত ঐ প্রাণবায়ুকে স্থির করতে পারলে মনও আপনা আপনি স্থির হয়ে যায় এবং তখন আত্মার স্বরূপ জানা যায়। তখন বোঝা যায় জলের যেমন তিন অবস্থা তরল হিসাবে জল, কঠিন অবস্থায় বরফ এবং বায়বীয় অবস্থায় বাষ্প সবার মূলে তাপের হেরফের—আত্মারও সেরূপ। অবস্থাভেদে জীব, জীবাত্মা এবং পরমাত্মা। সবার মূলে শক্তির তারতম্য ও হেরফের। আবার, একই পৃথিবীর মধ্যে যেমন বিভিন্ন মহাদেশ ও দেশ তেমনি এক পরমাত্মার অন্তর্গত জীবাত্মা ও বিভিন্ন জীবকুল। মূলে এক হয়েও কার্যকারণে ভিন্ন ভিন্ন—তফাৎ কেবল ক্ষুদ্র আর বৃহতের।

আমরা প্রথম যখন কোনও কাজ করি আত্মারূপী মন তখনি তার ভাল অথবা মন্দ, করা উচিত বা অনুচিত সমস্ত কিছুই সাথে সাথে জানিয়ে দেয়। এ'হল মানবশরীরের নিয়ন্ত্রক বা নিয়ন্ত্রণ-কর্তা। কিন্তু গাড়ী খারাপ হয়ে গেলে যেমন চালকের কিছুই করার থাকে না, তেমনি আমাদের মন যদি দেহের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, সম্পদ ভোগ, লোভ লালসা, কামনা বাসনা, আশা আকাঙ্ক্ষা, মায়া মোহে বশবর্তী বা আচ্ছন্ন হয়ে যায় তখন আত্মারও কিছুই করার থাকে না, আত্মা হাল ছেড়ে দেয়।

দেহের মরণ আছে, কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর, এর জ্বর, জরা ব্যাধি বার্ধক্য মরণ নেই। আমাদের মৃত্যুর পর আত্মা দেহ ছেড়ে যেখান থেকে আসে অর্থাৎ মরজগৎ ছেড়ে সেই অমরলোকে আবার ফিরে যায়। এখানকার অপর নাম মনোজগৎ অর্থাৎ মনের রাজ্য। এই আসা যাওয়ার সহজ ব্যাপারটি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জুনকে ছেঁড়া বা জীর্ণ কাপড় ত্যাগ করে নতুন কাপড় পরার

সাথে তুলনা দিয়ে গেছেন। মনের রাজ্য মনোজগতে দেহের কোনও স্থান নেই বা থাকে না, সমস্ত কিছু কাজ কারবার ঐ মনকে নিয়েই।

একটি প্রদীপের শিখা থেকে যেমন হাজার হাজার মোমবাতি জ্বালানো যায় প্রদীপ শিখার ক্ষয়-ক্ষতি হয় না, কিন্তু আলোর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তেমনি একই পরমাত্মা থেকে প্রাকৃতিক শক্তির মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ কি কোটি কোটি জীবাত্মার প্রকাশ ঘটে থাকে। এতে পরমশক্তির কোনওরূপ ক্ষয়-লয় হয় না, কিন্তু জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

আমরা একই লোহাকে এক বা একাধিকবার চুল্লির আগুনে গলন পিটন করে অথবা গলিয়ে ছাঁচে ফেলে প্রয়োজনানুসারে যেমন কাটারি, কোদাল, কড়াই, গাঁইতি, হাতুড়ি, কুড়ুল প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের লোহার আসবাবপত্র কি যন্ত্রাদি তৈরি করে থাকি তেমনি আমাদের বিধাতা পুরুষ প্রাণীকুলের কৃতকর্মের দিকে লক্ষ্য দিয়ে সৃষ্টির প্রয়োজনে একই আত্মা থেকে কখনো নিকৃষ্ট পশুজন্তু কখনো অতি বৃহৎ কোনও গাছ আবার কখনো উৎকৃষ্ট প্রাণী মানুষরূপে আমাদের তৈরি করে থাকেন।

একটি জীবাত্মা মানবদেহ পাওয়ার অভিলাষে জন্মদাতা পিতাকে প্রথমে স্পর্শ করে থাকে অধিক পক্ষে ২১টি দিন। পরবর্তীকালে মাটিতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ভ্রূণ অবস্থায় গর্ভধারিণী মাকে আশ্রয় করে থাকে ২৭০ থেকে ২৮০ দিন। এর পর আমরা জন্ম লই। জন্ম নেওয়ার আগে পর্যন্ত আত্মার নিজস্ব কোনও কাজ থাকে না। বাবা বা মায়ের আত্মার Function-ই নিজ আত্মার Function। জন্ম পাওয়ার সাথে সাথেই আত্মা আলাদা ভাবে তার কাজ শুরু করে দেয়। আমরা জন্মলগ্নে কাঁদার সাথে সাথে পূর্বজন্মের সমস্ত স্মৃতি ভুলে যাই, মায়ের আত্মার সাথে বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। কেবল ব্যতিক্রম অবতারগণ। এরা জন্মলগ্নে কাঁদেন না, সাময়িক ভাবে ভুলে গেলেও পূর্বস্মৃতি মনে রাখতে সমক্ষম হন বা হয়ে থাকেন।

মানব দেহ স্থূল অর্থাৎ তিন মাত্রা লম্বা চওড়া এবং উচ্চতা বিশিষ্ট। কিন্তু আত্মা সূক্ষ্ম, আমাদের ফোটো-তে দেখা ছবির মতো লম্বা বা উচ্চতা এবং চওড়া দুই মাত্রা বিশিষ্ট। সব আত্মাই দেখতে একই রকম। এক স্বচ্ছ স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র আলোর দ্যুতি। আত্মা এক বিশেষ শক্তি, এর প্রয়োজন বা অপ্রয়োজনও নেই, অবিরত একই ধারায় একই ভাবে চলে আসছে।

আত্মার মধ্যে পুরুষ নারী, শিশু যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা কোনও শ্রেণী বিভাগ নেই, নেই কোনও লিঙ্গভেদ। দেহের ভোগ আছে, তাই বাড়া কমা আছে, আত্মার এ'সবের কোন কিছুই নেই, সেই কারণে বাড়া বা কমাও

নেই। প্রতিটি আত্মা দেখতে একই রকম, পূর্ণ বয়স্ক পুরুষের ন্যায়। দেহ পাওয়ার সাথে সাথে ভেদাভেদ বা আলাদা আলাদা আকৃতি পেয়ে যায়।

আত্মাসমূহের দেখা আছে, শোনা আছে এবং কথা বলা আছে কিন্তু সব কিছু ইশারা ইঙ্গিতে, অবিকল স্বপ্নে দেখা, শোনা ও পারস্পরিক কথাবার্তা বলার সাথে যা তুলনীয়।

আত্মা পৃথিবীর বুকে ফেলে আসা বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, পরিবার পরিজনদের কথাবার্তা শুনতে পায় দূর থেকে ভেসে আসা কথাবার্তা শোনার ন্যায়। কিন্তু কোনও কথা বলতে পারে না। এদের বিয়োগে ব্যথিত হয়। কিন্তু আত্মীয়জন, বন্ধুবান্ধব, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার পরিজনাদির হা-হুতাশ কান্নাকাটির পরিবর্তে সমবেতভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনায় এরা সান্ত্বনা পায় বেশী করে। এই কারণে পৃথিবীর সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কাছে মৃত ব্যক্তির আত্মার মঙ্গল কামনায় প্রার্থনার প্রচলন আছে।

আত্মার পুরুষ নারী, গরিব ধনী, রোগী ভোগী, রাজা প্রজা, বুদ্ধিজীবী শ্রমজীবী এমনকি জাত বে-জাত বাছাবাছি নেই। যেহেতু পৃথিবীর মতো সম্পদ সুখ ভোগ ব্যবহার কি খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার নেই সেই কারণে আত্মা-আত্মায় পারস্পরিক হিংসা দ্বন্দ্ব রাগ বিদ্বেষ ঝগড়াঝাঁটি কি খুনোখুনি নেই, নেই রোগ ব্যাধি জরা জনিত দুঃখ কষ্টও। কিন্তু আছে বিশেষ এক ছাপ। পৃথিবীর বুকে সু অথবা কু কর্মফলজনিত কারণ হেতু ভেদাভেদ, আফসোস ও অনুশোচনা। সু-কর্মফলজনিত কারণে পাওয়া শুদ্ধ আত্মাগুলি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে সৌরলোক পর্যন্ত যাতায়াত করতে পারে—পায় সু-চরিত্র। পরবর্তীকালে নরলোকে সুখ সমৃদ্ধি হাসি খুশিতে ভরা উন্নততর জীবন। অপরদিকে কু-কর্মফলজনিত আত্মাগুলোর গতিবিধি একই রূপ। অতি দ্রুত হলেও পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আটকে যায়, ছাড়িয়ে উর্ধ্বলোকে যেতে পারে না। ঐ কর্মফলজনিত কারণে এরা বারবার পশুযোনিতে পরিভ্রমণ করতে থাকে অথবা পায় দুঃখ কষ্টে ভরা মনুষ্যদেহ। অবশেষে কর্মফলভোগ শেষে পায় উন্নততর মানবজীবন।

প্রাণায়াম সিদ্ধ মানবদেহ শুদ্ধ আত্মা পাওয়ার অধিকারী। এরা জীবিত থাকাকালীন স্থূলদেহ ছাড়িয়ে সূক্ষ্মদেহে এখানে ওখানে যত্রতত্র বিচরণ বা ঘোরাফেরা করতে পারেন। সাধক তৈলঙ্গ স্বামী অথবা গৃহী শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনে আমরা ঐরূপ ঘটতে দেখেছি।

নরনারীর মৃত্যুর পর আত্মার কার্যপ্রণালীতেও কিছু কিছু তফাৎ দেখা যায়। দুর্বল আত্মাগুলো পৃথিবীর মোহ কাটাতে পারে না, কেবলই হা- হুতাশ

করতে থাকে। পুনরায় পেতে চায় মানবদেহ, ফিরে আসতে চায় পৃথিবীতে। অপরদিকে উচ্চ গুণসম্পন্ন (পৃথিবীর বুকে কাজের ভিত্তিতে যা নির্ধারিত হয়) আত্মাগুলো সাময়িক মনোবেদনা কাটিয়ে ওঠে। পরন্তু পৃথিবীর বুকে ফেলে আসা আপন স্ত্রী সন্তান সন্ততির উন্নতি বিধানে তৎক্ষণাৎ তৎপর হয়ে ওঠে। তখন ঐ সকল জীবাত্মা অপরাপর জীবাত্মার (বিশেষতঃ আত্মীয় স্বজন যারা পৃথিবীর বুকে তখনো জীবিত আছেন তাদের জীবাত্মা) সাথে যোগাযোগ শুরু করে দেয়। ফলে পৃথিবীর বুকে ফেলে আসা অভিভাবকহীন নিজ পরিবার পরিজন অকালে ভেসে যায় না, অন্যান্য আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব পাড়া প্রতিবেশী এমনকি কোনও অচেনা অজানার মধ্য দিয়ে সমস্তরকম সুযোগ সুবিধা পেয়ে যায়। এই সাহায্য, সহানুভূতি ও সহায়তা অনেক সময় মৃত ব্যক্তি নিজে বেঁচে থাকাকালীন সুযোগ সুবিধার থেকেও অনেক বেশি হতে পারে বা হয়ে থাকে।

আগেই বলা হয়েছে জীব, আত্মা তথা জীবাত্মা এবং পরমাত্মা মূলতঃ একই রকম, কেবল শক্তির তারতম্য। এই কারণে জীব নিজ দেহকে কাজে লাগিয়ে পরমাত্মা পরমেশ্বরকেও জানতে সক্ষম হয়। তখনি জানতে পারে সৃষ্টি রহস্যের অনেক কিছুর সাথে সাথে আত্মা সম্বন্ধীয় যাবতীয় যা কিছু। জানতে পারে পরমাত্মা পরম শক্তি অতি বৃহৎ, আমরা জীব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, তাঁর শক্তির কণামাত্র।

আরো জানতে পারে— এই পৃথিবীর জল, বাতাস, ও মাটির সংস্পর্শে থেকে ঐ আত্মা সম্বন্ধে কোনও সঠিক ধারণা করা সাধারণ কেন বিশেষ পণ্ডিত বা জ্ঞানীদের পক্ষেও সম্ভব নয়। লাখ লাখ কি কোটি কোটি সাধু-সন্তদের মধ্যে সামান্য মাত্র দু-চারজন এর স্বরূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম হন বা হয়েছেন। আমরা পৃথিবীর সাধারণ জনগণ এর ধারে কাছে কোনও দিন ঘেঁসতে বা পৌঁছাতে পারব না, একে বশে আনা অলীক কল্পনা মাত্র। আমাদের বিজ্ঞান এখানে এখনও অনেক, অনেক দূরে।

আত্মমর্যাদা

আমরা আত্মমর্যাদার প্রশ্নে সবাই সচেতন, প্রত্যেকেই কমবেশী একই মত পোষণ করে থাকি। আত্মমর্যাদা বা নিজের সম্মানে আঘাতে ক্ষিপ্ত হই, অনেক ক্ষেত্রে কোর্ট-কাছারি ছাড়া খুনোখুনি পর্যন্ত ঘটে যায় বা করে ফেলি।

কিন্তু আত্মমর্যাদা একান্ত আপন, একান্ত নিজস্ব জিনিস, নিজের কাছেই— মোটেই হালকা বা ঠুনকো জিনিস নয়। এখানে কোনও দেওয়া বা নেওয়া

অথবা অন্যের দ্বারা ভাঙিয়ে কিংবা পাইয়ে দেওয়ার প্রশ্ন নেই। একজনের চিন্তাভাবনা, আচার আচরণ সর্বোপরি কাজকর্মই পারে তার নিজের মর্যাদা পাইয়ে দিতে। এককথায় আত্মমর্যাদার অর্থ নিজের মর্যাদা যা নিজের কাছে, নিজেই গড়ে নিজেই ভাঙে—কেহই দেয় না বা নেয়ও না।

একজনের দুঃসময়ে বা বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়ানো কি সুপরামর্শ দেওয়া, নিজে শিক্ষিত হয়ে অপরকে শিক্ষার আলোকে নিয়ে আসা, শিক্ষক হয়ে ছাত্রের পাশে কি ডাক্তার হয়ে রোগীর পাশে সর্বোপরি একজনের ভুলে সাজা দেওয়ার পরিবর্তে তার ভুল শোধরে দিয়ে বড় করে গড়ে তোলার সাথে সাথে নিজে বড় হওয়া অর্থাৎ নিজেরও মর্যাদা তথা আত্মমর্যাদা বাড়িয়ে নেওয়া সম্ভব। এই মর্যাদা মানুষকে ইহলোক ছাড়িয়ে পরলোকেও সম্মানিত করে থাকে।

আত্মমর্যাদার শেষ কথা — আত্মার মর্যাদা। যে কাজকর্ম বা আচার অনুষ্ঠানাদির দ্বারা আত্মার মর্যাদা বৃদ্ধি, সংরক্ষিত ও সুরক্ষিত হয়— তা আত্মমর্যাদা হিসাবেই পরিগণিত হয়ে থাকে।

আমি কে?

"প্রশ্ন করি নিজের কাছে কে আমি?"— এই আমিকে জানার প্রশ্ন মানুষের চিরকালের চিরদিনের, যা পরবর্তীকালে গানের কলিতেও স্থান পেয়েছে।

বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর দেশ বিদেশের বৈজ্ঞানিকগণ আমি কে?—এই প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন,—আমি অর্থে কোষ-কলা-অঙ্গ-তন্ত্রের সমন্বয়ে গঠিত লম্বা চওড়া এবং উচ্চতা বিশিষ্ট এক বিশেষ মূর্তি, পৃথিবীর বুকে যে মূর্তিটির উদ্ভব ঘটেছে প্রাণীকুলের মধ্যে সবার শেষে। ৮০ কি.গ্রা. ওজনের পূর্ণাবয়ব এইরূপ এক মূর্তির দেহকোষের সংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষ কোটি। এই সমস্ত কোষ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে মূলতঃ পেশী, যোগ, আবরণী ও স্নায়ু এই কলাগুলির সহযোগে। এই কলা থেকে অঙ্গ এবং পরবর্তীকালে তন্ত্রের মধ্য দিয়ে ত্রিমাত্রা বিশিষ্ট মানুষরূপ মূর্তিটির সৃষ্টি হয়েছে।

পুরাতত্ত্ববিদগণের মতে— আজ থেকে আনুমানিক ৪ কোটি ৬০ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর বুকে প্রথম সৃষ্টি হওয়া কোষ প্রোটোপ্লাজমের মধ্য দিয়ে উদ্ভিদ শ্রেণীর সৃষ্টি। পরবর্তীকালে অ্যামিবা,ভর্টিসেলার মত আদ্য প্রাণীর সৃষ্টি। এদের থেকে পর্যায়ক্রমে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে উত্তরকালে জন্ম হয়েছে মনুষ্যরূপ এই মূর্তিটির— যার নির্দিষ্ট আকার, আয়তন ও ওজন

আছে, আর আছে চলন-গমন-উত্তেজনা-অনুভূতি বংশবৃদ্ধির সাথে জন্ম ও মৃত্যু। আছে পারস্পরিক কথা বলার ক্ষমতা। এ ছাড়াও ঐ মূর্তিটির মধ্যে অন্য এক বিশেষ গুণের সমাবেশ ঘটেছে যা হল বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতার সাথে হুঁশ যুক্ত তার বিবেক বোধ।

দীর্ঘদিনের পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ঐ সকল বুদ্ধিজীবী শ্রেণী আরোও বলেছেন—পৃথিবীতে যখন থেকে খাদকের প্রয়োজনে খাদ্যের সৃষ্টি হয়েছে ঠিক তখন থেকে একের পাশে দুই বা ততোধিক অর্থাৎ অন্য এক সত্ত্বার উপস্থিতি অনুভূত হয়েছে, আর ঠিক তখন থেকেই 'আমি' এই বিশেষ ব্যক্তিসূচক শব্দটি বা সত্ত্বার পাশাপাশি তুমি, সে, উহার, তোমার বা তাহার প্রভৃতি পৃথক পৃথক সত্ত্বার প্রকাশ পেয়েছে বেশী মাত্রায়। কিন্তু সৃষ্টির প্রারম্ভে এই পৃথক সত্ত্বাবোধ জনিত ''আমি'' অর্থে আত্মবোধ সুপ্ত অবস্থাতেই ছিল, এখনকার মতো এতখানি প্রকট ছিল না। পরবর্তীকালে এর বিস্তার ঘটেছে ব্যাপক হারে। বিশেষ করে পৃথিবীর বুকে যখন থেকে জনস্ফীতি ঘটেছে অতি দ্রুতহারে — একজন মানুষ অন্যজনের বসবাস, খাওয়া-দাওয়া, কাজকর্ম, শিক্ষা-দীক্ষা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তৎসহ জৈব উত্তেজনায় সাড়া দেওয়ার সাথে সাথে মান-সম্ভ্রমের নেশায় মেতে উঠেছে হিংসা ও দ্বন্দ্বের পারস্পরিক লড়াইয়ে —মানুষ মানুষে খুন জখম রাহাজানিতে মত্ত হয়েছে, একে অন্যের বিরুদ্ধে গোষ্ঠী ছাড়াও নিজ নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে জেগে উঠেছে অধিকারের পাশাপাশি অন্য একজনের উপস্থিতি জনিত বিদ্বেষ ও লড়াকু ভাব ঠিক তখন থেকেই 'আমি' জনিত পৃথক সত্ত্বাবোধ প্রকাশ পেয়েছে পূর্ণমাত্রায়।

এই 'আমি'কে জানার জন্য আমাদের সাধককুলও বসে নেই, তারাও সমানভাবে করেছেন পরীক্ষা নিরীক্ষা। তারা দেখেছেন মানুষের আমিত্বের জন্ম ও মৃত্যুর সমস্ত কিছু তার নিজ নিজ দেহকে ঘিরে ও কেন্দ্র করেই। যতক্ষণ দেহ থাকে ততক্ষণ 'আমি' বোধ। সুতরাং এই আমির অস্তিত্ব ও উৎপত্তি ধরার জন্য মানবদেহকেই নিয়ে তারা করেছেন Culture, একে নিয়েই করেছেন Research।

এখান থেকে তারা জানতে পেরেছেন মানবদেহে 'আমি' অর্থে অহম্ বোধের জন্ম তার দেহ কাঠানোগত গুণ থেকে যা পৃথিবীর কাঠামোগত গুণেরই ঔরসজাত বা পৃথিবীর কাঠামো থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। পৃথিবীর কাঠামো ক্ষিতি (মাটি) অপ্ (জল) মরুৎ (বাতাস) এই তিনের অনুকরণে মানবদেহ যথাক্রমে রক্ত মাংস এবং অস্থি (মেরুদণ্ডের মধ্যস্থ শিরাগুচ্ছ) নিয়ে গঠিত এই মানবদেহ। এই মানবদেহের মধ্যে অনুপ্রবেশ

ঘটেছে রক্তের রাজসিক এবং মাটির তামসিক গুণের, যেখান থেকে জন্ম নিয়েছে প্রতিটি মানব শরীরে আমিত্ব ও অহংবোধ। মানুষের মেরুদণ্ডের মধ্যে লম্বালম্বিভাবে অবস্থিত স্নায়ুরজ্জুর মধ্যে যে বাতাস প্রবাহিত তা পৃথিবীর তৃতীয় কাঠামো বাতাস থেকেই পাওয়া। এর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে সত্ত্বগুণ। এই স্বত্ত্বগুণকে ফুটিয়ে তুলতে পারলেই মানবশরীরে রাজসিক ও তামসিক গুণের প্রভাব খর্ব হয় এবং তখনি মানুষের মনে 'আমি' এই বোধ কাটতে থাকে।

আসলে মানুষের স্থূলদেহ ছাড়িয়ে যে সূক্ষ্মদেহ (লম্বা ও চওড়া এই দ্বিমাত্রা বিশিষ্ট) তার মধ্যেই আছে 'আমি'-র প্রভাব তবে সূক্ষ্ম অবস্থায়। এই সূক্ষ্ম 'আমিতে' পৃথিবীর বুকে করে আসা ভুল কাজকর্মসমূহ ধরা পড়ে কিন্তু শোধরানো যায় না, শোধরানোর জন্য পৃথিবীতেই যেতে হয়।

এই মানবদেহকে Culture করে ভারতীয় সাধকগণ আরো জেনেছেন এই স্থূল ও সূক্ষ্ম 'আমি', দুই 'আমি' ছাড়িয়ে রয়েছে অন্য এক 'আমি'র অস্তিত্ব যা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। এখান থেকেই সমস্ত 'আমি'র জন্ম, কায়দা কানুন ধরা ও নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু সব থেকে মজার কথা এর মধ্যে জন্মদাতা নিজে বশীভূত নন, এখানে কেবল তুমি ও তোমাদের অর্থাৎ পৃথিবীর জীবকুলের জন্য সমস্ত কিছু। এই সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম আমি অর্থাৎ পরম পিতা পরমেশ্বরকে ধরতে পারলে সব আমিত্বের অবসান, তখন আমিও যা তিনিও তাই এই বোধ, কেবল অতি ক্ষুদ্র আর বৃহতের তফাৎ। আমাদের দরকার ঐ 'আমি'কে ধরার এবং জানার।

ইন্দ্রিয় কি ও কেন?

ইন্দ্রিয় অর্থে এমন বিশেষ দেহ যন্ত্রাংশ যেগুলোর সাহায্যে বা সাহায্য নিয়ে আমরা বিভিন্ন বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ কর্মসমূহ সু-সম্পন্ন করতে পারি বা সক্ষম হই। মানবদেহে এ'রূপ ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা মোট ১৪টি। এ'গুলির মধ্যে বাক (বাক্য), পাণি (হাত), পাদ (পা), পায়ু (মলদ্বার) ও উপস্থ (জননেন্দ্রিয়) —এই ৫টি কর্মেন্দ্রিয় এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক —এই ৫টি জ্ঞানেন্দ্রিয় আমাদের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত।

এরও বাইরে আছে আরোও মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত এই ৪টি অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় বা অতীন্দ্রিয়। যেগুলো এই সাধারণ চোখে দেখা যায় না। এই কারণে এর অপর নাম অন্তরেন্দ্রিয়, যার ক্ষমতা অসীম। এই ক্ষমতাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে সাধারণ দুটি চোখ ছাড়িয়ে মানুষ পেয়ে যায় তৃতীয়

এক চোখে দেখার অপরিসীম ক্ষমতা। এর দ্বারা মানুষের অন্তর্দৃষ্টিও খুলে যায়।

এই ইন্দ্রিয় সমূহকে যিনি যত বেশী কাজে লাগাতে পেরেছেন বা কব্জা করেছেন তিনি জীবনযুদ্ধে তত বেশী এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন, পেয়েছেন সফলতা। তবে শেষের ৪টি অন্তরিন্দ্রিয়কে বিকশিত করা আমাদের এই প্রথাগত শিক্ষার দ্বারা সম্ভব হয় না, এর জন্য দরকার হয় আধ্যাত্মিক শিক্ষার।

পূর্বে উল্লেখিত আমাদের মানবদেহ মধ্যস্থিত ঐ ১৪টি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একমাত্র অন্তরেন্দ্রিয়গুলোরই বিশেষ এবং ব্যতিক্রম ক্ষমতা আছে অপ্রমাণ্য জিনিসকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বা অনুভূতিতে ফুটিয়ে তোলার। ঈশ্বর সদৃশ জিনিসকে জানার ও বোঝার জন্য ঐ অন্তরেন্দ্রিয়গুলোর সাহায্য নেওয়া ছাড়া বিকল্প কোনও রাস্তা আমাদের সামনে খোলা নেই।

ইহলোক ও পরলোক — তফাৎ কোথায়?

ইহলোক অর্থে আমরা এখন যেখানে বসবাস করছি অর্থাৎ এই পৃথিবী এবং পরলোক অর্থে মৃত্যুর পরে আমরা যেখানে অবস্থান করি তা বোঝায়। ইহলোকে প্রাণের (দেহের) অস্তিত্ব থাকলেও পরলোকে প্রাণ (দেহ) যায় না। এখানে সমস্ত কাজ কারবার মনের।

মানুষের জন্ম মৃত্যুর জীবন চক্র কিভাবে সংঘটিত হয় তা এখানে এই পৃথিবীতে জানা যায় না। এখানে সমস্ত কিছুই অস্থায়ী, আজ আছে কাল নেই। এই কারণে ইহলোকের অপর নাম মরজগৎ বা মরলোক। অপর দিকে মৃত্যুর পরের লোকে মানুষের জীবন চক্রের সমস্ত কিছু জানা যায়, ভেদাভেদ টানা যায় স্থায়ী-অস্থায়ী সঠিক-বেঠিকের মধ্যে। এই কারণে পরলোকের অপর নাম অমর লোক বা অমর জগৎ।

ইহলোকে ভুলগুলি আমরা সহজেই শোধরাতে পারি, কিন্তু কি ভুল করে চলেছি তা ধরতে পারি না। অপর দিকে মৃত্যুর পর পরলোকে গিয়ে আমরা পৃথিবীর বুকে করে আসা ভুলসমূহ সহজেই ধরতে পারি কিন্তু শোধরাতে পারি না। ফলে কেবলই থাকে আফশোস্ ও অনুশোচনা। ইহলোক ও পরলোক এই দুইয়ের মধ্যে পরলোক একঘেয়ে অন্যদিকে ইহলোক বৈচিত্রময়, এই কারণে ইহলোক আমাদের কাছে বেশী আদরণীয়।

ইহলোকের সাধন ভজন সমস্ত কিছু মানবদেহকে নিয়ে, পরলোকে মনের দ্বারাই এসব বুঝতে হয়। সৃষ্টির এমনই কৌশল ওখান থেকে ফিরে এসে এ'সবের কিছুই বলা যাবে না।

সাকার ও নিরাকারে ঈশ্বর

ঈশ্বর সাকার অথবা নিরাকার এ নিয়ে মতভেদ আছে। কেহ বলেন সাকার অন্য কেহ বলেন ঈশ্বর নিরাকার। কিন্তু উভয়ের মূলে আছে বোঝাপড়া, প্রকৃত বোঝাপড়া থাকলেই বলা সম্ভব ঈশ্বর সাকার অথবা নিরাকার।

সাকার অর্থে আমরা সাধারণতঃ স্ব অর্থাৎ যার নিজস্ব আকার, আয়তন, ওজন ও মাপ আছে তারেই বুঝে থাকি। এ সবের কিছু না থাকলে বলে থাকি নিরাকার। 'সাকার' এই শব্দটি সর্বত্র ব্যবহার হয়ে থাকলেও 'নিরাকার' কথাটি কেবলমাত্র বিশেষ এক ক্ষেত্র ঈশ্বরের গুণ মহিমা বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

একই পাত্রের জল কেবল তাপের তারতম্যে কখনো কঠিন, আবার অন্য অবস্থায় বায়বীয় কিন্তু মূলে H_2O এর মিলিত যোগ বা বিয়োগ ফল। বোঝাপড়া হয়ে থাকলে ঐ জিনিস ধরা পড়ে। ঈশ্বর সাকার অথবা নিরাকার ঐরূপ বোঝাপড়ারই ফল, না জানলে বলা যায় না। তবে ঈশ্বর অর্থে প্রকৃতপক্ষে নিরাকারকেই বোঝায়, যার কাজকর্মের প্রকাশ সাকারের মধ্য দিয়ে। এরূপভাবে চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র ফুল ফল লতাপাতা গাছপালা পাহাড় পর্বত নদ নদী জল মাটি আলো বাতাস পশুপাখী সমস্ত কিছু সাকারের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের মহিমার প্রকাশ।

প্রকৃতপক্ষে সাকার অর্থে যুক্তিগ্রাহ্যের ভেতরকার এবং নিরাকার অর্থে এর বাইরের জিনিসকেই বোঝায়। যুক্তি গ্রাহ্যের ভেতরকার বস্তু ব্যক্তি এবং তাদের গুণাবলীর মধ্য দিয়ে যুক্তিগ্রাহ্যের বাইরের জিনিস — এ সবের উৎপত্তি কোথা থেকে? কি ভাবে? কেন বা কি জন্য? এর পিছনে কে বা কারা? তা জানা সহজ ও সম্ভব হয়। পুরাকালে ভারতীয় আর্য ঋষিগণ এভাবেই ঐ সাকারের মধ্য দিয়ে নিরাকার ঈশ্বরের সন্ধান পেয়েছিলেন। ওদের থেকেই আমরা ঈশ্বরের স্বরূপ অর্থাৎ সাকার ও নিরাকার রূপ এবং তাঁর গুণাবলী জানতে পেরেছি।

ঈশ্বর যদি থাকেন — দেখতে পাচ্ছি না কেন?

সমাজের এক দল যাদেরকে আমরা সাধক সম্প্রদায় হিসাবে জানি তারা ঈশ্বর আছেন বলে থাকেন, ঈশ্বরের গুণ কীর্তন করে থাকেন, আমাদেরকে বিশ্বাস করতে বলেন কিন্তু দেখাতে পারছেন না, অথবা আমরা দেখতে পাচ্ছি না— কারণ কি?

ঈশ্বরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না তার কারণ—ঈশ্বর এক শক্তি, নির্গুণ নিরাকার বিরাট শ্বেত-শুভ্র এক আলোক-দ্যুতি। তাকে আমরা দেখতে বা ধরতে অক্ষম, তার মূল কারণ আমাদের কাঠামোগত শারীরিক গুণ। আমাদের শরীর যে উপাদানে তৈরি সেই জল ও বাতাসের গুণ এমনি তা ঈশ্বর সদৃশ শক্তিরূপ জিনিসকে কোনভাবেই সহজে ধরতে দেয় না।

আকাশে সূর্য সব সময়ে, তার আলো বিশ্বজুড়ে সর্বত্রই থাকে কিন্তু মেঘে ঢাকা থাকলে যেরূপ দেখা যায় না, তেমনি জলকণা মিশ্রিত প্রাণবায়ু ঈশ্বর সদৃশ জিনিসকে সর্বদা আড়াল করে রেখেছে যা ঈশ্বর সমীপে কোনও ভাবেই আমাদেরকে পৌঁছাতে দিচ্ছে না। দেহ থেকে ঐ প্রাণবায়ুকে সরাতে পারলে ঈশ্বর সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়। কিন্তু এ জিনিস বাস্তবে রূপ দেওয়া এক রকম অসম্ভব। দেহের উর্ধ্বাঙ্গ মস্তিষ্কে আছে আমাদের দুটি চোখ যা ছোট বড় নিকট দূর বহু বহু জিনিস দেখতে পায় কিন্তু ঐ চোখের কোনও ক্ষমতা নেই তার সব থেকে কাছের জিনিস নিজ মুখমণ্ডল দেখার। এই হল মানবদেহের কাঠামোগত গুণ। ঈশ্বর আমাদের কাছে আমাদের সঙ্গেই আছেন কিন্তু ঐ কাঠামোগত গুণেই মানব শরীরে যতক্ষণ প্রাণবায়ু সঞ্চিত থাকে ততক্ষণ ঈশ্বর সদৃশ জিনিসকে দেখা যায় না বা আমরা ধরতে পারি না।

সৌরলোক মহাশূন্য। সেই কারণে ওখানে ঈশ্বরের কাজ কারবার অতি দ্রুত ধরা পড়ে, কিন্তু মহাশূন্যে আমাদের বাতাস না নিয়ে বেঁচে থাকা আর গল্পের গরু গাছে ওঠা দুইই সমান, এই কারণে ঈশ্বর সদৃশ জিনিসকে আমরা কোন সময়েই দেখতে পাচ্ছি না, ধরতে পারা তা আরো অনেক পরের কথা।

ঈশ্বর আছেন — প্রমাণ কোথায়?

ঈশ্বর আছেন, কিন্তু প্রামাণ্য রূপে দেখানো যাচ্ছে না, কারণ সৃষ্টির বৈচিত্র্যতার নিয়ম। সৃষ্টির সমস্ত কিছু একই সূত্রে বা নিয়মে ধরা সম্ভব নয়, প্রতিটি জিনিসে আছে বিভিন্নতা আছে বৈচিত্র্যতা— যা আমরা প্রতিটি ফুল ফল লতা-পাতা পশু-পাখি কিংবা জীবজন্তুর মধ্যে পেয়ে থাকি। জল এবং তেল উভয়েই তরল হয়েও বিভিন্ন। আগুন জলের দ্বারা নিভানো যায় কিন্তু ইলেকট্রিক এমনি এক ব্যতিক্রম আগুন যা জলের দ্বারা নিভানো যায় না। যে দাঁড়ি পাল্লায় কুইন্টাল কি মন মন কাঠ ওজন করা যায় তার বড় Capacity থাকলেও সেখানে সামান্য ১০ গ্রাম সোনা ওজন করা সম্ভব হয় না। এসব

বহুবিধ একের পর এক উদাহরণ সহযোগে ঈশ্বর বোঝাতে চেয়েছেন সৃষ্টির সমস্ত জিনিসকে একই নিয়মে কি একই সূত্রে ফেলা যায় না। সুতরাং একের কাজ অন্যের দ্বারা হয় না। এইরূপ ব্যতিক্রম অথচ সহজ সরল অতি বাস্তব জিনিসসমূহ ধরিয়ে দেওয়ার জন্যই আমাদের লাখ লাখ কি কোটি কোটি মানুষের অতি সামান্য মাত্র দু-একজনের মধ্যে তিনি দিয়েছেন অবিশ্বাস্য এক ক্ষমতা, অভাবনীয় এক গুণ—যার জন্যই পৃথিবীতে লিখিত হয়েছে গিনেস বুক অফ রেকর্ডস্। এইভাবে এই সকল বিরল বিশেষ ব্যক্তি, বস্তু কিংবা ঘটনার দ্বারা ঈশ্বর প্রমাণ করতে চেয়েছেন তার অস্তিত্বের কথা, তিনি চাক্ষুস প্রমাণের বাইরে। একে আর পাঁচটি জিনিসের মতো সমানভাবে বিচার করা সঙ্গত নয়।

কোন জিনিস টক-তিতো-ঝাল-মিষ্টি বা অন্য কিছু —এর সঠিক স্বাদ পেতে যেরূপ ঐ জিনিস অতি অবশ্যই খেয়ে বা পান করে দেখতে হয় নতুবা এর স্বাদ পাওয়া এবং অন্যকে বোঝানো যায় না। কোনও বৈদ্যুতিক তারে Current আছে কিনা তা যেমন Bulb লাগিয়ে অথবা Tester-এর সাহায্য নিয়েই বলা যায়, চোখে দেখে বলা যায় না, অথবা কাউকে যেমন বিষধর কোন সাপে কামড় দিলে ঐ যন্ত্রণা তার নিজের পক্ষেই বলা সম্ভব হয় অন্যের পক্ষে বলা সম্ভব হয় না, তেমনি একমাত্র ঈশ্বর তত্ত্ব বোধ হওয়ার পরেই জানা যায়—ঈশ্বর প্রত্যক্ষ অনুভূতির জিনিস—নিজের উপলব্ধিতেই একে ধরা সম্ভব, বিভিন্ন উপমা কি উদাহরণ সহযোগে এর ক্ষমতার ব্যাখ্যা দিয়ে অন্যকে বোঝানোও সম্ভব কিন্তু একে প্রত্যক্ষভাবে আপামর জনগণকে দেখানো বা প্রামাণ্যরূপে তুলে ধরা সম্ভব নয়, ঐরূপ চিন্তাই সৃষ্টির নিয়মের অনুরূপ চিন্তা পরিপন্থী চিন্তা মোটেই তা নয়।

এ'রূপ এক অপ্রমাণিত ঈশ্বর সদৃশ জিনিস দেশ বিদেশের বিভিন্ন ভাষাভাষি তথা জাতির কাছে সৃষ্টির ঊষাকাল থেকে যুগ যুগ ধরে, আজও বিজ্ঞানের এই দ্রুত অগ্রগতির যুগেও মানুষের সরল বিশ্বাসে ধরা আছে এর পিছনে সারবত্তা আছে বলেই। তবে, আমাদের সকলের দরকার ঈশ্বর ঈশ্বর করে হা-হুতাশ করা নয়, তাঁর প্রমাণ অপ্রমাণ নিয়ে কোনওরূপ তর্ক-বিতর্ক কি বাগ-বিতণ্ডায় যাওয়াও নয়, পরন্তু ঈশ্বর আছেন—এই সহজ সরল বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে চলা। এর থেকেও বেশী দরকার নিজ নিজ কর্তব্যকর্মে ব্রতী হওয়া এবং দায়িত্ব পালনে সচেতন থাকা।

ঈশ্বর না মানলে ক্ষতি কি?

আমরা জীবিত বা মৃত বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি কি মহাপুরুষদের স্মরণ করি, আমরা নেতাজী, ক্ষুদিরাম, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, নিউটন, আইনস্টাইন, রামকৃষ্ণদেব প্রভৃতি মনীষীদের শ্রদ্ধা করি অথবা না করি ক্ষয়ক্ষতির কিছুই থাকে না, কিন্তু তাদের কার্যবিধি এবং জীবনের মহৎ গুণগুলি বা উপদেশ সমূহ কাজে লাগাতে পারলে নিজের লাভ ছাড়া ক্ষতির কিছুই থাকে না। অনুরূপভাবে মঠ মন্দির মসজিদ গীর্জা প্রভৃতিতে পূজা দেওয়া বা না দেওয়া, ঐশ্বরিক সত্ত্বাকে মানা অথবা না মানা ঐ একই জিনিস। ঈশ্বরকে না মানলে নিজের অথবা ঈশ্বরের কারো ক্ষতি বা হারানোর কিছুই থাকে না, ঈশ্বর আমাদের শাস্তিও দিতে পারেন না, কিন্তু মানলে আমাদের লাভই বেশী। মনে ভরসা আসে, মন স্থির হয়, হা-হুতাশ কাটিয়ে ওঠা যায়, মনোবল বাড়ে। উপরন্তু আমরা বিশ্বের জনগণ সবাই যে মূল একই ঐশ্বরিক সত্ত্বা থেকে উদ্ভুত, কার্যকারণে আলাদা বা বিভিন্ন হয়েও মূলে এক তা ভেবে পারস্পরিক মত বিনিময় ও ভাব আদান প্রদানে চলতে অনেক বেশী সুবিধা হয়।

তবে একটি কথা বিশেষভাবে জানা এবং মেনে চলার দরকার তা হল প্রাকৃতিক নিয়ম, যে নিয়ম ঐশ্বরিক সত্ত্বারই অস্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ। ঐ নিয়ম মেনে চললে যেমন আমাদের লাভ অপরদিকে অবহেলা, তাচ্ছিল্য অবজ্ঞায় আমাদের প্রত্যেকেরই ক্ষতিতে পড়ে যাওয়া বা লোকসান অবশ্যম্ভাবী।

ঈশ্বরকে জানবো কেন?

ঈশ্বরকে জানার দরকার আমাদের সুস্থ সুন্দর সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনে যা যা করার দরকার সেই সঠিক নিয়মনীতি এবং তার যথাযথ প্রয়োগ পদ্ধতি জেনে নিয়ে অপরকে তা জানিয়ে দেওয়ার জন্য। জীবকুলের মধ্যে মানুষ যে শ্রেষ্ঠ তা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য।

ঈশ্বরকে আমরা ডাকবো সমস্ত রকম হতাশা কাটিয়ে বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া এবং ভয় থেকে মুক্তি পাবার জন্য।

ঈশ্বরকে আমরা জানবো তার সৃষ্টিতে কোন জিনিস স্থায়ী আর কোনটা অস্থায়ী, কোনটি ঠিক, কোনটি বেঠিক, কোনটি উচিত কোনটি অনুচিত তা বুঝে নিয়ে নিজেদের কাজে লাগানোর জন্য।

ঈশ্বরকে জানার আরো দরকার আমাদের অন্ধত্ব, মূঢ়ত্ব, ধর্মের নামে গোঁড়ামি এবং সমস্ত রকম কু-সংস্কার এবং ভণ্ডামি দূর করার জন্য।

ঈশ্বরকে আমাদের মানার সব থেকে বেশী দরকার এই প্রামাণ্য নির্ভর বৈজ্ঞানিক জগতে অপ্রমাণিত অথচ অতিশয় বাস্তব এই চিরসত্য শাশ্বত সনাতন ঈশ্বর সদৃশ জিনিসটির অস্তিত্ব এবং তার স্বরূপ জনসমক্ষে সঠিক ও স্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্য। তাঁর সৃষ্টির প্রতিটি জিনিস কেমন ভাবে এবং কত সুন্দর ভাবে জনকল্যাণে কাজে লাগানো যায় তা নিখুঁতভাবে জেনে নেওয়া ও অন্যকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য।

ঈশ্বরকে জানবো কীভাবে?

জলের মধ্যে যে লবণ আছে তা জল মারলেই জানা যায়। এর জন্য শিক্ষা নিতে হয়, জানতে হয় জল থেকে লবণ বের করার পদ্ধতি। তেমনি আমরা ঈশ্বরকে জানবো শিক্ষার দ্বারা, শিক্ষার বিশেষ কৌশলে ঈশ্বরকেও জানা যায়।

শিক্ষার মাধ্যমেই আমাদের সমস্ত কিছু বোঝাপড়া। শিক্ষা একটা কৌশল— অজানাকে জানিয়ে দেওয়ার কৌশল। ব্যবহারিক জগতে যেমন ডাক্তারি, প্রযুক্তি বিদ্যা, অর্থনীতি, দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষার জন্য আলাদা আলাদা দিক ও পথ বা বিভিন্ন কৌশল আছে অনুরূপভাবে ঈশ্বর তথা ঐশ্বরিক সত্ত্বাকেও জানার জন্য নির্দিষ্ট কিছু কিছু কৌশল আছে। ঐ নির্দিষ্ট পথের কোনও একটি কৌশল অবলম্বন করে হাঁটতে থাকলে ক্রমে ক্রমে ঐশ্বরিক সত্ত্বার অনুভূতি ঘটতে থাকে, একদিন দর্শনও মিলে যায়। কিন্তু বাক্য ও তার ভাবার্থ এই দুইয়ের মধ্যে যেমন অনেক তফাৎ তেমনি ঈশ্বর দর্শন এবং তার নিগূঢ় রহস্য ভেদ করা মোটেই এক নয়, বহু তফাৎ। ডক্টরেট হতে গেলে মাধ্যমিক পাশ করে বসে থাকলে হবে না, মাধ্যমিকের পর ধাপে ধাপে অনেক উপরে উঠতে হবে। একই ভাবে ঈশ্বরের স্বরূপ তথা সৃষ্টির গোপন রহস্য ভেদ করার জন্য কেবল ঈশ্বর দর্শন লাভে ক্ষান্ত থাকলে হবে না, উপযুক্ত গুরুর হাত ধরে আরো নিষ্ঠা, ধৈর্য ও অধ্যবসায়ে সাধন ভজনের কঠিন থেকে কঠিনতর পথ হয়ে কঠিনতম শিক্ষার পথে এগোতে হবে। একেবারে শেষের দিকে আর বহু পথ নেই। হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদি, জৈন, পারসি, খ্রিস্টান, ইসলাম সব ধর্মের সমস্ত পথ মিলে পথ একটাই, — যেটি হল দেহ থেকে প্রাণবায়ু নিঃশেষিত করে বেঁচে থাকা ও সাধন ভজন চালিয়ে যাওয়া — নাম যোগ সাধনা, যে কথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন। এই পথে এগোন খুবই কষ্টকর। প্রতি পদে পদে বিপদ, মৃত্যুর থাবা। প্রথমাবস্থায় গর্ভবতী মায়েদের অস্বস্তির সাথে তুলনীয়। খাওয়া শোওয়া বসা কাজ করা

কথা বলা এমনকি ঘুমানো কোন কিছুতেই স্বস্তি থাকে না। এই অবস্থা কাটিয়ে এগোতে থাকলে এক সময় জীবন্ত ব্যক্তিকে জলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করার মতোই অবস্থা হয়। খুবই সন্তর্পণে অতি সতর্কতার সহিত ধীরে সুস্থে প্রতি পদে পদে মাপজোক করে চলতে পারলে তবেই রক্ষা। দেশ বিদেশের লক্ষ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে হাতে গোনা সামান্য মাত্র দু'চারজন ঐ পথের শেষ প্রান্তে পৌঁছাতে পেরেছেন, ভেদ করতে পেরেছেন সৃষ্টির গুহ্যতম রহস্য। পেয়ে গেছেন অপার্থিব আনন্দ। সাধক ছাড়া সাধিকা বা সন্ন্যাসিনীদের মধ্যে কেহ ঐ চরম তথা পরম অবস্থায় পৌঁছাতে পেরেছেন, এ নজির সম্ভবত নেই।

ঈশ্বরের স্বরূপ

ঈশ্বর অর্থে বিশেষ কোন এক শব্দ নয়, কোনও ব্যক্তি বা বস্তু নয়, পরন্তু বিশেষ এক শক্তি বা গুণ যার উপাসনা করে আমরা কৃতার্থ হই। ঈশ্বর পরমেশ্বর, সৃষ্টিকর্তা, পরমব্রহ্ম পরমাত্মা পরমসত্ত্বা মূলতঃ একই জিনিস।

ঈশ্বর নির্বাক এবং অব্যক্ত — তার কোনও কথা বা বাক্য নেই, তাকে ব্যাখ্যাও দেওয়া যায় না। চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র, অসীম মহাকাশ, পৃথিবীর ফুল ফল জল নদ-নদী পাহাড়-পর্বত, বনভূমি জলভূমি, জীবকুল প্রভৃতি প্রকাশের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে তার ভাব তার ভাষা। এর মধ্য দিয়েই তার সৃষ্টির সমস্ত কিছু ধরতে হয়। যেহেতু তার ব্যাপ্তি বিশ্বচরাচর ব্যাপী সেই কারণে তার ছোঁয়াচ বিশ্বের প্রতিটি জীব প্রতিটি জিনিসে বর্তমান। বিশ্বের যে কোনও জায়গা থেকে যে কোনও সময় তারে ধরা সম্ভব। ঈশ্বর এমনি এক বিশেষ ব্যতিক্রম জিনিস বা শক্তি যার স্বর বা ধ্বনি আমরা কানে শুনতে পাই না বা আমাদের কর্ণগোচরে আসে না।

ঈশ্বর নির্গুণ, নিরাকার, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ — অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং তার গুণাবলী যুক্তি তর্ক এমনকি বুদ্ধিতেও ব্যাখা দেওয়া যায় না। তিনি সকল গুণ, সকল রূপ ও সমস্ত আনন্দেরও উপরে যার কোনও মাপজোক কি সীমা-পরিসীমা নেই।

ঈশ্বরের রূপ স্বচ্ছ শুভ্র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অথচ উচ্চ শক্তিসম্পন্ন এক অতি তেজোময় আলোকদ্যুতি। এর ধারে কাছে সাধারণ মানুষ ছাড়িয়ে বিজ্ঞানীরাও কোন দিন ঘেঁসতে পারবে না। একে বশে আনতে নিজের পতন তথা ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য। একমাত্র কঠোর সাধন ভজনের দ্বারা উপযুক্ত পথ প্রদর্শকের সহায়তায় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্বই পারেন তাঁর স্বরূপ জানতে ও

ঈশ্বরীয় মহিমার ব্যাখ্যা দিতে। কিন্তু পুরো কি সম্পূর্ণ ব্যাখা দেওয়া কারো একার পক্ষে সম্ভব নয়।

ঈশ্বর থেকে মানুষ

বাঙলার কীর্তনীয়া সমাজে একটি গান বহুল প্রচলিত আছে। যেটি হল— "প্রভু কে তোমায় চিনিতে পারে?" সত্য সত্যই ঐশ্বরিক সত্ত্বার মহিমা অপার, একে চেনা ও জানা খুবই কষ্টকর। জন্ম-জন্মান্তরের সাধন ভজনের দ্বারা ও সুকৃতির জোরে ঐ শক্তির অপার লীলা মহিমা জানা যায়। তখনি জানা যায় ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ জীব আমাদের মানুষের জন্ম বৃত্তান্ত।

যেখান থেকে জানা যায় — ঈশ্বর নির্গুণ, নিরাকার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, অতি তেজোময় পৌরুষকার শক্তি সম্পন্ন বিরাট এক তীব্র আলোর দ্যুতি— রঙ সাদা। সবার মূলে ইনি— একম্ অদ্বিতীয়ম্। এখান থেকেই জন্ম হয়েছে সূক্ষ্ম বিশ্বপ্রকৃতির।

বিশ্বপ্রকৃতি মাতৃস্বরূপা। চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্রাদি থেকে শুরু করে আমাদের এই পৃথিবী সবই এর করতলগত। সমস্ত রকম দেব-দেবী এবং উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সাধু মুনি ঋষি থেকে মহাপুরুষ সবাইকার জন্ম ঐ সূক্ষ্ম প্রকৃতি থেকে—এরা প্রত্যেকেই প্রাকৃতিক জ্ঞান সম্পন্ন। সূক্ষ্ম প্রকৃতি ঠাণ্ডা অথচ তাপশক্তি (কয়লার মতোই) যার রঙ কালো। যেহেতু সূক্ষ্ম প্রকৃতির রঙ কালো সেই কারণে এই অপ্রাকৃত জ্ঞান যারা লাভ করেছেন তাদের গায়ের রঙ স্বাভাবিক ভাবেই কালো যা লোক সমাজে শ্যামবর্ণ নামে কথিত হয়ে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরামচন্দ্র এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ, যেখানে গৌরাঙ্গদেব বিশেষ ব্যতিক্রম —একই অঙ্গে পুরুষ ও প্রকৃতি (অন্তঃকৃষ্ণ বহিঃরাধা ভাবাবিষ্ট) হয়ে গৌর বর্ণে রঞ্জিত।

সূক্ষ্ম প্রকৃতি থেকে সৃষ্টি হয়েছে স্থূল প্রকৃতির অর্থাৎ এই পৃথিবীর আবহাওয়া মণ্ডলের সমস্ত কিছু। স্থূল প্রকৃতির রঙ নীল। এর মধ্য দিয়েই পৃথিবীর সমস্ত জীবকুল যেখানে সবার শেষে আমরা মানুষ।

ঈশ্বরের মনুষ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য

ঈশ্বর আমাদের মনুষ্যরূপে সৃষ্টি করেছেন। এই সৃষ্টির পিছনে কি উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে তা আমাদের অনেকেরই অজানা। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকেরই জানার দরকার রয়েছে। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন তারই নিজ হাতে গড়া প্রকৃতির যন্ত্ররূপে—প্রকৃতির শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা, প্রকৃতির উৎকর্ষ বিধানে রত থাকার জন্য। তিনি যন্ত্রী আমরা যন্ত্র, যন্ত্রের যেরূপ কাজ আমাদেরও

তাই। আমাদের কাজ সৃষ্টির সঠিক নিয়ম নীতি জেনে নিয়ে তা মান্য করে চলা, সৃষ্টির প্রতিটি জিনিসকে ব্যবহারপযোগী করে গড়ে তোলা ও জনজীবনের কাজে লাগানো। আরো কাজ ঈশ্বরের অসীম কৃপা ও অপার করুণার জয়গান করা, তাঁর মহিমা বিশ্বে প্রচার করা।

শিক্ষক যেমন ছাত্রের কৃতকার্যতায়, পিতামাতা যেমন সন্তানসন্ততির সফলতায়, চাষী যেমন তার হাতে তৈরি উৎপন্ন ফসলের উৎকৃষ্টতায় উৎফুল্ল হন আমাদের সৃজন কর্তাও তেমনি তাঁর দ্বারা সৃষ্ট জীবকুলের কর্মদক্ষতা ও নৈপুণ্যে খুশী হন। এই খুশীর জোয়ারে প্লাবন ডাকে যখন তার দ্বারা সৃষ্ট জীবকুলের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ সৃষ্টির রহস্য ভেদ করতে সক্ষম হন এবং তার বিচার বুদ্ধির প্রশংসা করেন। ঈশ্বরের মনুষ্য সৃষ্টির সব থেকে বড় কারণ হল এটাই।

ঈশ্বর কোন কিছু সরাসরি ধরিয়ে দিচ্ছেন না কেন?

আমরা সবাই সাধু মুনি ঋষিদের থেকে সর্বদা একটি বিশেষ কথা শুনে থাকি, যেটি হল—ঈশ্বর মঙ্গলময়, তিনি আমাদের সবাইকার কল্যাণ চান। মনে প্রশ্ন জাগে ঈশ্বর যদি প্রকৃতই কৃপাময় ও করুণাময়, তিনি যদি সত্যই আমাদের মঙ্গল চান তাহলে তিনি আমাদের ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতি সরাসরি ধরিয়ে দিচ্ছেন না, সর্বদা নীরব থাকছেন, কোনও সময়ে মুখে বলে দিচ্ছেন না কেন?

আপাতদৃষ্টিতে এর ফলে আমাদের সবাইকার ভালই হত, ঝগড়াঝাটি বাদ বিসম্বাদ তর্ক-বিতর্ক থাকত না, আমরা সবাই হাসিখুশি পরম সুখ শান্তিতে থাকতে পারতাম, এরূপ মনে হলেও বাস্তবে তা ঘটত না। শিশু জন্মের পর থেকে কৈশোর অবধি বাবা-মায়ের কোলে থাকলে হাঁটা চলা শিখতে পারত কি? পরীক্ষার পিছনে পড়াশোনার ব্যবস্থা বাদ দিয়ে কেবল পাশ করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলে আমরা জীবন যুদ্ধে কোনও দিন জয়ী হতে পারতাম না, চিরকাল অন্ধকারেই থেকে যেতাম— তাই নয় কি?

ঈশ্বর আমাদেরকে সরাসারি ধরিয়ে দেন না অথবা তিনি নিজে নির্বাক থাকার একটি মাত্র কারণই হল মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটানো, তাদের আনন্দের রসাস্বাদ থেকে বঞ্চিত না করা, চির আনন্দ পাইয়ে দেওয়া। আমরা যে জিনিসের পিছনে যত বেশী কায়িক বা মানসিক শ্রম দিই, মেহনত করি অথবা যে জিনিস যত বেশী জটিল তা সমাধানে তত বেশী আনন্দ পেয়ে থাকি। সোজা অংকের থেকে কঠিন অংকের সমাধানে, অথবা সাধারণ রোগীর

থেকে মরণাপন্ন রোগীকে বাঁচিয়ে তোলাতে আনন্দ পাই বেশী করে, সৃষ্টি কর্তার সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনার এই ফল। এই চিন্তাভাবনার ফলেই তিনি আমাদের সরাসরি ধরা দেন না, কোন জিনিস সরাসরি ধরিয়েও দেন না। পরিবর্তে একদিকে দিয়েছেন আমাদের বেঁচে থাকার যাবতীয় উপাদান ও উপকরণ অন্যদিকে ঐ সকল উপকরণ সমূহকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য উৎকৃষ্ট গুণাবলী সমন্বিত মানবদেহ রূপ বিশেষ এই যন্ত্রটি।

ঐশ্বরিক শক্তি

ঈশ্বরের প্রকাশ তার শক্তি তথা ঐশ্বরিক শক্তির মধ্য দিয়ে। ঈশ্বরের করুণা যেমন অপার, মহিমা যেমন অতুলনীয়, তেমনি এর শক্তি অকল্পনীয়। এক এবং অদ্বিতীয় ঐ শক্তিতেই বিশ্বচরাচরের প্রতিটি জিনিস সৃষ্টির শুরু থেকে আজও সুনিয়ন্ত্রিত। মানুষের পক্ষে ঐ শক্তির কাছে ঘেঁসা কোনও দিন সম্ভব নয়, নিজেই Fuse হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা শতভাগ ।

ঐ মূল ঐশ্বরিক শক্তি পৌরুষকার শক্তি নামেই পরিগণিত হয়ে থাকে। এক থেকে দুই তথা বহুর প্রয়োজনে ঐ পৌরুষকার শক্তি থেকে উদ্ভব হয়েছে প্রকৃতির। তত্ত্ব থেকে জন্ম হয়েছে তথ্যের তথা ব্যবহারিকের। পুরুষ ও প্রকৃতি এই উভয়ের মিলনেই সৃষ্টি ও সৃষ্টির পরিপূর্ণতা।

কর্মফল বাস্তবে কিছু আছে কি না?

জন্ম যেখানে সেখানে বা যথা-তথা অথবা যেমন তেমন হয়ে থাক না কেন আসলে কর্মই সব। কর্মের গভীরতা, ব্যাপ্তি ও প্রসারতা অনুযায়ী এর ফল সুদূর প্রসারী, এক জন্ম ছাড়িয়ে পরের জন্ম পর্যন্ত বিস্তারিত হতে পারে। বিনা দোষে অন্ধ মুনির পুত্র সিন্ধুকে বধ করার অপরাধে রাজা দশরথ নিজ পুত্র রামচন্দ্র বিহনে প্রাণত্যাগ করেছেন। অপরদিকে রামচন্দ্র সীতা উদ্ধারের নিজ স্বার্থে বালি বধ করেছেন— এই ভুলের ফল স্বরূপ পরজন্মে কৃষ্ণরূপে বালির ছেলে জরার দ্বারা বধ হয়েছেন। এই-ই হল সৃষ্টির নিয়ম, মনুষ্যদেহ ধারণকারী কারো পক্ষে এ নিয়ম থেকে পরিত্রাণ পাবার কোনও উপায় নেই, কর্মজনিত ফল ভোগ করতেই হবে।

আমাদের অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস কি বদ্ধ ধারণা আছে যে, কর্মফল জনিত কারণে শারীরিক রোগ ব্যাধি এক জন্ম ছাড়িয়ে পর জন্ম পর্যন্ত বিস্তারিত হয়, কিন্তু বাস্তবে এমনটি ঘটে না। যেহেতু পূর্বজন্মের স্থূলদেহের সাথে পরজন্মের স্থূলদেহের কোনও যোগযোগ থাকে না, সমাধিস্থ অথবা পোড়ানোর পর দেহ শেষ হয়ে যায়—কিন্তু যোগাযোগ থাকে সূক্ষ্ম দেহ মনে। স্থূলদেহের

মৃত্যু ঘটলেও সূক্ষ্মদেহ অবিকৃত থাকে। ফলে 'সু' অথবা 'কু' কর্মফলজনিত গুণ তথা ফলগুলি মনে ধরা থেকে যায়। পরবর্তীকালে নতুন দেহ পাবার সাথে সাথে সূক্ষ্মমনের প্রভাব স্থূলদেহে Automatically বিঁধে যায়, আমরা সমস্ত রকম সহায় সম্পদ পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত থেকেও একজনকে কোনও না কোনও কারণে (অথচ যা হওয়ার কথা নয় এ'রূপ কারণে) মানসিক অশান্তিতে ভুগতে দেখি—এ'গুলো পূর্ব জন্মগত কোনও না কোনও গর্হিত কর্মের ফল হিসাবেই চিহ্নিত।

কর্মের ফলাফল বলতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—এজন্মের কর্ম যেরূপ ভাবে বা যেখানে শেষ হবে, পরজন্মে সেরূপ ভাবে বা সেখান থেকে শুরু হবে, অর্থাৎ একজন MA, BED. পাশ করা জনকল্যাণে আত্ম নিয়োগকারী প্রধান শিক্ষক পরজন্মে পড়াশুনা বা পরীক্ষায় পাশ না করে সরাসরি প্রধান শিক্ষক হয়ে যাবেন বাস্তবে তা মোটেই সম্ভব নয়, কিন্তু সম্ভব পড়াশুনোর সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধাদির মধ্য দিয়ে একের পর এক ধাপ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাওয়া এবং পরবর্তীকালে শিক্ষা বা জনকল্যাণ মূলক কোনও না কোনও কর্মের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকা।

কর্মফলের কথা বলতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ গীতায় আরো বলেছেন— **"কর্মন্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"** অর্থে কর্মের জন্য মানুষ তুমি সৃষ্ট, কর্ম করে যাওয়া বিধেয়, ফলাফলের দিকে নজর দেওয়ার দরকার নেই—কর্ম করে গেলে তার ফল মিলবেই, কেহই রোধ করতে পারবে না। আগুনের ক্ষমতা যেমন বাতাসকে কাছে টেনে আনতে বাধ্য করা, তেমনি কর্মের গুণই হল আত্মনিয়োগ কি অনুস্মরণকারীদের যথাযথ ফল পাইয়ে দেওয়া। এ জিনিস সৃষ্টির নিয়মেই সবার জন্য আছে ধরা, এখানে প্রকৃতি কারো প্রতি কোনওরূপ অবিচার, বৈষম্য কি কার্পণ্য করেননি, করেননি বৈমাতৃসুলভ আচরণও। তবে, সুকর্মের ফল প্রচুর অর্থকড়ি কি ভোগ্য সম্পদ ভোগ অথবা প্রভূত যশমান খ্যাতি লাভ সাধারণের চিন্তাভাবনায় এমনটি মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে মোটেই তা নয়, পরন্তু মানসিক সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি, যা পর্যাপ্ত টাকা পয়সা কি অপর্যাপ্ত ভোগ্য সম্পদেও মেলে না। আমরা জানি না, বুঝি না সেই কারণে বৃথা আফসোস, অনুশোচনা, হা-হুতাশ করে মরি কি ক্রোধান্বিত হই।

গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মধ্য দিয়ে আমাদের আপামর জনগণকে কর্মের সাথে যুক্ত হয়ে কর্মে উদ্বুদ্ধ কর্মযোগী হতে পরামর্শ দিয়েছেন। এই কর্মের মাধ্যমেই আমাদের যাবতীয় মানসিক সুখ শান্তি ও প্রশান্তি। ঐ কর্মকেই

চলার পথের পাথেয় করে এগোতে থাকলে জন্ম জন্মান্তরের প্রচেষ্টায় একদিন না একদিন ঈশ্বর সমীপে পৌঁছানো যায় এবং একমাত্র তখনি জানা যায় জন্মান্তরবাদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা কর্মফল ও তার বাস্তবতার কথা।

আরো জানা যায়, প্রতিটি জিনিসের ন্যায় প্রকৃতিতেও কর্মের একটা নির্দিষ্ট ছক আছে। মাছ যেমন জলে বাঁচে, জল ছাড়া বাঁচতে পারে না, তেমনি আমরা প্রতিটি নারী পুরুষ প্রকৃতির নিয়মেই কর্মের সুনির্দিষ্ট ছকেই বাঁধা। এই কর্মের গুণেই আমাদের উন্নতি ও অবনতি। একজন দেবসুলভ সম্মান পাবার অধিকারী, অন্যজন অমানবিক আচরণে নিন্দিত। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং রাজা দুর্যোধন যথাক্রমে এই দুইয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কর্ম তথা কর্মফলের অবাধ গতি, ইহলোক ছাড়িয়ে পরলোক অর্থাৎ মৃত্যুর পরের জগতেও যেতে পারে। মৃত্যুর পরেও একজনের কর্মফলই তাকে পৃথিবীতে বাঁচিয়ে রাখে। অপরদিকে আমরা দেখি মৃত্যুর পর জমি গহনাগাটি বন্ধু বান্ধব পাড়া প্রতিবেশী এমনকি নিজ স্ত্রী পুত্র সন্তান-সন্ততি কিছুই বা কেহই সঙ্গে যায় না। কিন্তু এই কর্ম ও তজ্জনিত ফল নিজ একান্ত অনুগত ভৃত্যের মতো মৃত্যুপথের সহযাত্রী হয়ে সঙ্গে যায়। আমরা জানি বা না জানি, মানি বা না মানি এই-ই হল সৃষ্টির System, সুতরাং আমাদের বুঝে-সুজে চলা উচিত।

কুল কুণ্ডলিনী কি?

দেহমধ্যে সর্পের ন্যায় কুণ্ডলীভাবে তিনটি বেষ্টনীর দ্বারা মূলাধারে বিরাজিত জীবসমূহের পরমা শক্তির নাম কুণ্ডলিনী শক্তি।

সাপ আমাদের জড়ি বন্ধন। সাপের শ্বাসতন্ত্র প্রণালীর অনুকরণে মানবদেহের শ্বাসতন্ত্র তৈরি। সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীই হল মানবদেহের আদিমতম শক্তি বা বীজ। এর থেকেই ক্রমান্বয়ে একের পর এক অবস্থা কাটিয়ে আমরা মানুষ। সাপের ফোঁস অর্থাৎ ফণা নিবৃত্ত করতে পারলে সর্পশক্তি বা সাপের বিষঢালার ক্ষমতা শেষ।

মানুষের দেহের ভেতরকার বাতাসই হল সাপের ফোঁস। ঐ বাতাস ঈশ্বরীয় পথে এগিয়ে যাওয়ার পথে বিষ অর্থাৎ বাধাস্বরূপ, পথের কাঁটা। যোগীগণ ঐ বাধা কাটিয়ে ওঠার জন্য সাধনভজনের দ্বারা মানব শরীরের সর্বনিম্ন মূলাধারে অবস্থিত কুণ্ডলিনী শক্তিকে সর্ব প্রথম জাগরিত করে উর্ধ্বমুখী করেন, যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে আমরা পৃথিবীর বুকে আবদ্ধ হয়ে আছি

তা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হন, ক্ষমতা অর্জন করেন পৃথিবীর মাটিতে থেকেই সৌরলোকে পৌঁছে যাবার। এই অবস্থায় পৌঁছে যেতে পারলে অতি সহজে ঈশ্বর তত্ত্ব জানা সম্ভব হয়ে যায়।

যোগসাধনার পথে আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রথম সোপান হল এই কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত করা। এ এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি। আগে ভাগে জানা না থাকলে এই অবস্থা সাধকের কাছে খুবই ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু, পরবর্তীকালে নতুনকে পাবার আনন্দে মনে শিহরণ জাগে, মন পুলকিত হয়, ক্রমান্বয়ে সাধন ভজনে এগিয়ে যাওয়ার পথে অনেক বেশী সাহস সঞ্চয় হয়ে থাকে।

কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত হওয়ার লক্ষণ?

ক্রিয়াযোগ পদ্ধতিতে অধ্যাত্ম সাধনার প্রথম সোপান কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত হওয়া। এই শক্তি জাগরিত হওয়ার প্রাক্কালে পদ্মাসনে বসে থাকা অবস্থায় সাধকের মধ্যে ব্যতিক্রম কিছু লক্ষণ প্রকাশ পায়, যেগুলো হ'ল —

* সাধকের মাথা অতি ধীরে ধীরে মাটিতে স্পর্শ করে যায়, আধ্যাত্মিক পরিভাষায় এর নাম Earthing হয়ে যাওয়া।

* মাথা মাটি থেকে কোনমতেই তোলা সম্ভব হয় না।

* সোজা হয়ে বসা, দাঁড়ানো এমনকি শোওয়াও সম্ভব হয় না।

* অন্যের কথা শুনতে পাওয়া যায়, কিন্তু নিজে কোন কথাই বলতে পারা সম্ভব হয় না।

* দেহের বোধ থাকে কিন্তু শারীরিক ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে লোপ পেয়ে যায়।

* গলা শুকিয়ে কাঠ, সম্পূর্ণ আড়ষ্ট হয়ে যায়, প্রাণান্তকর অবস্থা, প্রাণ বেরিয়ে যাবার উপক্রম হয়।

* মনের মধ্যে অজানা এক আশঙ্কা দেখা দেয়।

এই অবস্থা সাধারণত ২০ থেকে ২৫ মিনিট চলতে থাকে, এরপর সাধক ধীরে ধীরে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। যৌগিক সাধন প্রণালী আচরণকারী সাধকের ক্ষেত্রে এ'রূপ অবস্থা ঘটে থাকে কমপক্ষে এক থেকে পর পর তিনদিন পর্যন্ত।

এই অবস্থায় সাধকের আচরণেও কিছু কিছু তারতম্য ঘটতে দেখা যায় একজন সাধকের কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত হওয়া কালীন অবস্থা প্রথম ঋতুমতী হওয়া নারীদের সময় অবস্থার সাথে তুলনীয়। এখনকার লক্ষণগুলি—

* লজ্জা লজ্জা ভাব, জনসমক্ষে আসতে না চাওয়া, সব সময় আড়ালে নিজেকে গুটিয়ে রাখতে চাওয়া।

* কথাবার্তা কমিয়ে দেওয়া, লোকজনের সাথে মেলামেশা করতে অনীহা, খাওয়া-দাওয়া কমিয়ে দেওয়া।

* সব সময় ঝিমুনি ভাব বা ঝিমিয়ে থাকা।

* শরীরে লোহিত কণিকা কমতে থাকা, শ্বেত কণিকা বাড়তে থাকা।

* শরীর সাদা ফ্যাকাশে হতে থাকা।

* রক্তের চাপ কমতে থাকা।

* মনে সব সময় ভয়-ভীতি ভাব জাগতে থাকা, নিজের অসুবিধার কথা অন্যদেরকে বলতে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব—এ কি হল? কেন হল?—খারাপ কিছু হয়ে যাবে নাকি? —এরূপ ভয়-ভয় ভাব।

অন্যদের সাথে কিছুদিন মেলা মেশা করতে থাকার পর অথবা কোন বই থেকে অথবা অন্য কোন ভাবে এ বিষয়ে অবগত হওয়ার পর সাধকের মধ্যে ক্রমশঃ জড়ত্ব কাটতে থাকে। তখন নতুনকে জানার বা নতুন কিছু পাবার আনন্দ দেহ মনে অন্য অনুভূতি জাগতে থাকে, ঠিক মায়েদের গর্ভে প্রথম সন্তান আসার মতোই।

যৌগিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়া ছাড়াও কেবলমাত্র নাম জপেও একজনের কুল-কুণ্ডলিনী জেগে যেতে পারে, তবে এরূপ জিনিস কদাচিৎ কালেভদ্রে দু-একজনের ভাগ্যে ঘটে থাকে।

গুরুর দরকার কেন?

ঈশ্বর নির্বাক, তার নিজস্ব কোনও বাক্য বা ভাষা নেই, কেবল আছে অখণ্ড নীরবতা। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সুচারুরূপে ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি নিরাকার থেকে এসেছেন সাকারে। সূক্ষ্ম থেকে এসেছেন স্থূলতে—ঘটেছে প্রকাশ। এই প্রকাশের মধ্য দিয়েই তাকে ধরতে হয়। এর জন্য দরকার হয় কোন না কোনও মাধ্যম অথবা মধ্যস্থতাকারীর। এই কাজটি একেবারে শিশুকালে আমাদের বাবা-মা, পরবর্তীকালে আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী বন্ধু বান্ধব এবং আরো পরে স্কুল কলেজের শিক্ষকগণ সম্পন্ন করে থাকেন।

অপরদিকে আমাদের এই মানবদেহে প্রাণ থেকেও জড় — যেহেতু তা অন্ধত্বে ভরা, ভালো মন্দ, সঠিক বেঠিক, উচিত অনুচিত, স্থায়ী অস্থায়ী সে ধরতে পারে না, কেবলই ভোগ করতে চায়, মনকে করে প্রভাবিত, কালক্রমে মনও তার স্বকীয় সত্তা হারিয়ে ফেলে। স্থির মনে দেখা দেয় অস্থিরতা, দেহ

ও মনের এইরূপ অজ্ঞতা তথা অন্ধকারত্ব কাটিয়ে তোলার জন্য দরকার এমন এক ব্যক্তিত্বের যিনি সঠিক পথের হদিশ বা ঠিক ঠিকানা দিতে পারেন। কাটিয়ে দিতে পারেন আমাদের অজ্ঞতা ও অন্ধকারত্ব। এইরূপ ব্যক্তিত্বকেই আমাদের পুরাণাদিতে গুরু নামে অভিহিত করা হয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কাছে গুরুর প্রয়োজনীয়তা সমানভাবে স্বীকার করা হয়েছে। সৃষ্টির মূলকে ধরতে মূলের অধীন সেই গুরুকেই ধরতে বলা হয়েছে সবার আগে—"সবার আগে সৎগুরুকে স্মরণ করো রে"।

সাধন ভজনের প্রতিটি কাজে বিশেষ করে ক্রিয়াযোগ পদ্ধতিতে স্থূল দেহধারী গুরুর দরকার খুব বেশী। সূক্ষ্ম শরীরে গুরু শিষ্যকে সমস্ত রকম পথ বাৎলে দিতে পারেন কিন্তু Field তৈরি বা ক্ষেত্র প্রস্তুতি অর্থাৎ নিজে করে হাতে-নাতে দেখিয়ে দিতে পারেন না। ফলে ব্যবহারিক বা **Practical**-এর দিকটা সব সময়েই ফাঁক কি উপেক্ষিত থেকে যায়। এই অবস্থায় উৎসুক হয়ে কেবলমাত্র পুঁথিগত শিক্ষা বা শোনা কথা ধরে এগোলে যে কোনও সময়ে চরম বিপদেও পড়ে যাবার সম্ভবনা প্রবল।

গুরুর কাজ

সারা বিশ্বে মোটামুটি ১২৫টি ধর্ম সম্প্রদায় আছে। সেখানে সর্বত্রই গুরুর প্রয়োজনীয়তা একবাক্যে স্বীকার করা হয়েছে।

গুরুর দায়িত্ব অপরিসীম। গুরুর প্রধান কাজ—শিষ্যরূপ ক্ষেত্রে ঈশ্বর সাধনরূপ বীজ রোপন করা। গুরুর আরো কাজ—সংসারাঘাতে পঙ্গু, রোগ শোকে জর্জরিত, জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত শিষ্য-শিষ্যাগণকে সমস্ত রকম বিপদ-আপদ-ভয়ভীতি-ঘাত-প্রতিঘাত থেকে রক্ষা করা, তাদের মানসিক অশান্তিতে শান্তির প্রলেপ দেওয়া, সমস্ত রকম বিভ্রান্তি, সমস্ত রকম প্রতিবন্ধকতা, বাধা বিপত্তি কাটিয়ে তাদেরকে প্রকৃত সত্যের পথ দেখানো।

সুতরাং গুরুর কাজ কেবলমাত্র সাধন ভজন পূজা পার্বণ কি যাজন যজন নয়, পরন্তু বহুমুখী। এর জন্য গুরুকে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন যথা অভিভাবক, বন্ধু, সখা, প্রভু, শিক্ষক, পরামর্শদাতা কিংবা প্রতিনিধি ও পথ প্রদর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। বিশেষ প্রয়োজনে গুরু শিষ্যের কাছে শত্রুর ভূমিকায় বা শত্রুর ন্যায় আচরণও করতে পারেন, এতে ক্ষতির কিছুই থাকে না। ঐ যাবতীয় দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জ্যন কোনও গুরুর ভক্ত শিষ্য শিষ্যার সংখ্যা Capacity এর বাইরে বাড়ানো মোটেই যুক্তি সঙ্গত নয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব এই কারণেই তাঁর শিষ্য সংখ্যা বাড়াননি।

আজকের এই বিশ্বাস অবিশ্বাসের যুগে প্রতিটি গুরুর দরকার তিনি সাধন ভজনে যা পেয়েছেন ও জেনেছেন তা সবাইকে অকপটে জানানো, এক্ষেত্রে নীরবতা বা মৌনতা মোটেই কামনীয় নয়। মনে রাখার দরকার শৃগাল তবুও ভাল কিন্তু নীলবর্ণে রঞ্জিত হয়ে রাজা সাজা শৃগাল মোটেই ভালো লক্ষণ নয়।

সৎগুরু কে?

সৎগুরু হচ্ছেন তিনি যিনি সৎ অর্থে প্রকৃত সত্যকে জেনেছেন। অন্য কথায়, সৎগুরু হচ্ছেন তিনি যিনি 'স্ব'-অর্থে নিজেকে জেনেছেন। পরম সত্য পরমব্রহ্মকে জানলে ঐ 'সৎ' ও 'স্ব' সমস্ত কিছুই জানা যায়। লক্ষ লক্ষ সাধু ঋষিদের মধ্যে সামান্য মাত্র দু একজন ঐ পরম সত্য পরমব্রহ্মকে জানতে সমর্থ হন। ঐ রকম ব্যক্তিত্বকে যিনি গুরুরূপে পেয়ে থাকেন তিনিই প্রকৃত পক্ষে সৌভাগ্যবান।

ঐ পরম সত্য পরম জ্ঞান যিনি লাভ করেছেন অথবা বলীয়ান হয়েছেন তিনি মঠ মন্দির মসজিদ গীর্জা কি গুম্ফাতে অথবা বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপনে আগ্রহী হন না। নির্জন নিভৃত অরণ্য কি পাহাড় পর্বতের গুহাতেও নিজে আবদ্ধ থাকতে পারেন না। টাকা পয়সা লোভ-লালসা যশ মান খ্যাতি সমস্ত কিছুই-তার কাছে মূল্যহীন, তুচ্ছ হয়ে পড়ে। তার উদ্দেশ্য থাকে কেবলমাত্র ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করা ও প্রসার ঘটানো —আপামর জনগণকে কর্তব্যকর্মে উদ্বুদ্ধ করা। বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ব অর্থাৎ 'বোধি' তথা পরম জ্ঞান লাভ করার পর পরমপুরুষ ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সিদ্ধিলাভ করার পর, ঐ একই কাজ করে গেছেন। কেহই মঠ মন্দির মিশন গুম্ফা প্রতিষ্ঠার দিকে নজর দেননি, উভয়ের জ্বর জরা বার্ধক্য কাটিয়ে সংসার জীবনে সুস্থভাবে থাকার পথগুলি মানুষকে বাৎলে দিয়েছেন। ঐ রকম ব্যক্তিত্বকে আমরা নিঃসন্দেহে সৎগুরুর আসনে বসাতে পারি।

সৎগুরু চেনা যাবে কেমনে?

মরচে ধরা লোহাতে যেমন ভাল কাজ হয় না তেমনি সংসারযাত্রা নির্বাহে বিশেষ করে সাধন ভজন পথে এগোতে উপযুক্ত পথ প্রদর্শক তথা সৎগুরুর প্রয়োজন খুব বেশী হয়ে পড়ে— সৎগুরু ছাড়া ঠিক ঠিক কাজ হয় না।

প্রকৃত সত্য জেনেছেন অর্থাৎ প্রাকৃতিক জ্ঞান লাভ করেছেন এরকম ব্যক্তির শারীরিক গঠনের মধ্যে বিশেষ কিছু কিছু লক্ষণ থাকে যেগুলো থেকে তাকে সহজেই চেনা যায়, যার মধ্যে প্রধানগুলি—

(১) আজানুলম্বিত বাহু অর্থাৎ হাত দু'টি হাঁটু পর্যন্ত প্রসারিত।

(২) হাত হাঁটু থেকে মাটিতে ঠেকে যাওয়া বা স্পর্শ হওয়া।

(৩) ভ্রু-দ্বয় জোড়া।

(৪) ভ্রু-দ্বয়ের অবস্থান কানের উপরে হওয়া।

(৫) বুক পর্যাপ্ত লোমে ঢাকা।

(৬) হাতের পাতার রঙ লোহিত বা লাল বর্ণ হওয়া।

(৭) সাপে কাটা মৃত নরনারী যেরূপ সাপের বিষের নীল রঙ পেয়ে যায় তেমনি যারা প্রকৃতিজ জ্ঞান লাভ করেছেন বা করতে সমর্থ হবেন তাদের গায়ের রঙ মূল প্রাকৃতিক শক্তির রঙ, কালো রঙ (কথিত শ্যামবর্ণ) হয়ে থাকে। রামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ, উভয়েই অপ্রাকৃত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

(৮) গাছ যেমন ফলের ভারে নত হয়ে যায়, তেমনি যারা সত্য সত্যই অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ করে থাকেন তাদের জীবনযাত্রা অতি সহজ সরল শিশুর মতোই একেবারে সাদামাটা হয়ে যায়। তাদের ভেতর আড়ম্বর প্রিয়তা বা জাঁকজমক কিছুই থাকে না। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে তিলক অথবা হাতে আংটি কি **Stone** প্রভৃতি সমস্ত কিছুর প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। সমস্ত জীবের কল্যাণ কামনায় তাদের থাকে একটাই প্রার্থনা —''গোবিন্দ রাখো চরণে''।

(৯) যে কোনও ব্যক্তির গুণাগুণ তার রক্তের চাপেও ধরা পড়ে। অসৎ চিন্তা, কর্মে ফাঁকি, অলসতা, চতুরতা, কু-কর্মের ন্যায় অনুরূপ কাজে রক্তের উপর বারবার চাপ পড়ে। ফলে নার্ভগুলো পাতলা হয়ে যায় ও রক্তের চাপ বাড়ে। সৎকর্ম ও সৎচিন্তায় এমনটি হয় না, আধ্যাত্মিক চেতনা ও গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের রক্তের চাপ সাধারণভাবে কম অর্থাৎ Low Pressure হয়ে থাকে। এসব থেকেও একজনকে সৎগুরু হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

(১০) এ'গুলো ছাড়াও হাত এবং পায়ের পাতা এবং কপালে অন্যান্য কিছু কিছু বিশেষ চিহ্ন থাকে যেগুলো সাধারণ চোখে ধরা পড়ে না, জ্যোতিষ শিক্ষাতেই ধরা সম্ভব।

(১১) একজন সাধক অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ করেছেন কিনা তা সব থেকে বেশী করে ধরা পড়ে তার শ্বাস প্রশ্বাসে। এখানে তার শ্বাসের গতি থাকে মৃদু মন্থর, যা নাকের ডগায় তুলার সাহায্যেই ধরা পড়ে।

উপরিল্লিখিত লক্ষণযুক্ত সাধককে আমরা নিঃসন্দেহে সৎগুরুর পর্যায়ে ফেলতে পারি।

সৎগুরু যদি না পাওয়া যায় আমাদের কি করা উচিত?

প্রতিটি কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য বিশেষ করে সাধন ভজনের যৌগিক পথে সৎগুরুর প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী এ কথাটি আমরা সবাই জানি কিন্তু পরম সত্যকে জেনেছেন এ'রকম সৎগুরু বাস্তবে পাওয়া খুবই দুরূহ, পাওয়া একরকম সম্ভব নয়। তাহলে উপায় কি? অথবা আমাদের কি করা উচিত?

পরমসত্য পরমব্রহ্মকে জেনেছেন এরকম ব্যক্তিত্বকে যদি না পাওয়া যায় তাহলেও আমাদের হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নেই। কারণ শক্তির এমনি এক Capacity যা গুরু অথবা শিষ্য কারো কাছে বাঁধা পড়ে না। ঢালু পথ পেয়ে যে কোনও তরল পদার্থ যেরূপ নীচের দিকে গড়াতে থাকে অথবা বাতাস যেমন নিজ গুণেই ফুলের সুগন্ধ দূর দূরান্ত থেকে বহন করে নিয়ে আসে, তেমনি একজন ভক্ত অথবা শিষ্যের ব্যাকুলতাই তার জন্য সুনির্দিষ্ট গুরুকে কাছে টেনে আনতে বাধ্য করে থাকে। এখানে উভয়ের মধ্যে কাজ করে থাকে তাদের জীবাত্মা, দুই জীবাত্মার মধ্যে আগে ভাগে মিলন ঘটে যায়। একলব্যের ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া—এর এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সুতরাং সত্যকে জেনেছেন অথবা জয় করেছেন এরকম মহাপুরুষকে হাতের নাগালে পাওয়া না গেলেও পরিবর্তে ন্যায়নীতি পরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, ধার্মিক, নির্লোভ, সদাচারী উন্নত চরিত্র প্রভৃতি সু-গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে গৃহী হলেও গুরুরূপে বেছে নেওয়া খুব বেশী কষ্টকর নয়।

গুরু সম্পর্কীয় একটি বিশেষ শ্লোক বহুল প্রচলিত আছে, যা বা যেটি হ'ল—"যদ্যপি আমার গুরু বেশ্যা বাড়ী যায় তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়"। গুরুর কাজ কারবার আচার আচরণ নিয়ে শিষ্যের চিন্তাভাবনা বা তর্কবির্তক করার কোনই দরকার নেই, কেবল দরকার বিশ্বাস আর আনুগত্য। এই আনুগত্য, শিষ্যের শ্রদ্ধা ভক্তি নিষ্ঠা ভালবাসার একাগ্রতার গুণে ভণ্ড গুরুও দূর হয়ে যায়, একদিন মিলে যায় অভিপ্রেত ও উপযুক্ত গুরু।

সৃষ্টির এমনি সুন্দর **System** যেখানে স্বপ্নের মধ্য দিয়েও একজনের গুরু মিলে যেতে পারে, তবে এ জিনিষ জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতিতেই সম্ভব, দু'দশজনের ভাগ্যে ঘটে থাকে।

তবে সব কাজে আছে পূর্ব প্রস্তুতি। বাবা মা অন্যান্য গুরুজন সহ দেব-দ্বিজে ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন, ছোটদের প্রতি স্নেহ ভালবাসা, সত্য পথের আশ্রয় নেওয়া ও অনুসন্ধান, সৎ ভাবে জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়া, গুরুর সন্ধান মেলার কাজে পরোক্ষভাবে অনেক বেশী সাহায্য করে থাকে। কোনও

আশ্রম বা প্রতিষ্ঠানে চোখ কান খোলা রেখে কিছুদিন যাওয়া-আসা করলেই সেখানকার ভালো-খারাপ সমস্ত দিক জানা হয়ে যায়। কিন্তু কোন সময়েই রূপের মোহে আকৃষ্ট হয়ে অথবা বাক্ চতুরতায় আপ্লুত হয়ে কিংবা বিরাট জটাজুট বা মুণ্ডিত মস্তক সন্ন্যাসী দেখে সৎগুরু বা ব্রহ্মজ্ঞানী হিসাবে ধরে নেওয়া মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

বিরাট কোন প্রতিষ্ঠান, শিষ্য-শিষ্যার সংখ্যা কি তার রমরমা দেখেও এগোন বা গুরু নির্ণয় করাও সাধারণের ঠিক নয়, ঠকে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। বড় বড় কি প্রথিতযশা প্রতিষ্ঠান সমূহে বড় বড় তথা রথী মহারথীদের প্রাধান্য বেশী, সঙ্গতিহীনদের বিপদে আপদে পরামর্শ পাবার সুযোগ খুবই কম। তবুও বলতে হয়, উপায় না থাকলে অগত্যা "নেই মামার থেকে কানা মামা"— এই সব প্রতিষ্ঠানগুলির দেওয়া উপদেশ সমূহ, নিয়মনীতি, সাবধানতা ইত্যাদি মেনে চললে নিজের সংসার ও সমাজজীবনে ক্ষতির সম্ভাবনা অনেক কম।

মানব জীবনের উপর গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব

পৃথিবীর সংসার কেবলমাত্র জীবকুলকে নিয়ে তা নয়। পরন্তু চন্দ্র, সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহ এবং নক্ষত্রাদিকে নিয়ে। স্থূল এবং সূক্ষ্ম প্রকৃতি এই উভয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন (ধরে রাখার কায়দা) করে রেখেছে গ্রহাদি। এরা উভয়ের মধ্যে সমতা রেখে চলেছে। অপরদিকে, পৃথিবীর গতিকে উপরের দিকে বেরিয়ে না যাওয়ার কায়দা করা রয়েছে ঐ গ্রহাদির মধ্যে। গ্রহ ও নক্ষত্র সমস্ত কিছুই সৃষ্টি করা হয়েছে পৃথিবীর প্রাণীকুল বিশেষত মানুষ ও তাদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য। গ্রহাদির মধ্য দিয়ে জন্মলাভের ধারা মানুষের মধ্যে এসে যায়।

প্রতিটি গ্রহের নিজস্ব নিয়ম নীতি আছে। এদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সৌরলোকে সূক্ষ্ম প্রকৃতি থেকে যার সর্বময় কর্তা সূর্য। সৌরলোকের গ্রহগুলি সূর্যের থেকে শক্তি টেনে নিচ্ছে এবং আমাদের জন্মের সময়কালীন প্রয়োজনানুসারে তা ছেড়ে দিচ্ছে। এরই প্রভাবে মানুষের রুচিবোধ, চিন্তাভাবনা, বোঝাপড়া ও বুদ্ধিবৃত্তির তারতম্য। এই সকল গ্রহ নক্ষত্রাদির প্রভাবে আমরা চালাক-বোকা, সুবোধ-নির্বোধ, সুবিবেচক-অবিবেচক, স্থিরমতি-চঞ্চলমতি, মেধাবী-হীনবুদ্ধি কিংবা স্থূলদর্শী-সূক্ষ্মদর্শী প্রভৃতি গুণসমূহ পেয়ে থাকি।

বিভিন্ন গ্রহের ভিন্ন ভিন্ন কাজ, একই কাজ নয়। মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি রবি গ্রহগুলি উত্তম কাজ সূচিত করে থাকে। কিন্তু শনির দ্বারা এটি হয় না।

বৃহস্পতি মাতৃস্বরূপা— প্রাণীকুল সৃষ্টির মূলে ইনি। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সরাসরি বৃহস্পতির অধীনে চলে যান। বৃহস্পতির কৃপা না থাকলে জীবিত লোকের পক্ষে সৌরলোকে অর্থাৎ সৃষ্টির নিয়ম পদ্ধতি স্থলে পৌঁছানো কোনও ভাবেই সম্ভব হয় না।

রবি মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি চন্দ্র রাহু এবং কেতু জ্যোতিষ শাস্ত্রে বর্ণিত এই নয়টি গ্রহের মানবজীবনের উপর প্রভাব প্রত্যেকের হাতের রেখাতে দেওয়া আছে। এখান থেকে অনুধাবন করা যেতে পারে, তবে এর জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শিতা, বিশেষ দক্ষতা কি পটুতা থাকার দরকার।

গুরু ও শিষ্যে তফাৎ কোথায়?

দেহকাঠামোগত গুণের আপাত বিচারে গুরু-শিষ্যে কোনও তফাৎ নেই। কিন্তু মূল তফাৎ আছে শিক্ষায়, আছে বোঝাপড়াতে। গুরু তার কঠোর সাধন ভজনের দ্বারা আধ্যাত্ম শিক্ষার এক এক স্তর অতিক্রম করে ত্রিনয়ন লাভ করেন, জানতে পারেন সৃষ্টি রহস্য—বক্তব্য রাখতে পারেন এর উপর। শিষ্য এ'সবের কিছুই পারেন না, যা কিছু পারেন গুরুর কৃপায়। সুতরাং গুরুর কাছে যা নিজ উপলব্ধিগত প্রত্যক্ষ, শিষ্যের কাছে তা পরোক্ষ।

যোগী গুরুরা প্রকৃতির অক্সিজেন নিয়ে বেঁচে থাকতে পারেন দিনের পর দিন, শিষ্যেরা তা পারেন কেবলমাত্র গাছপালা **Refine** করে দেওয়ার পর। প্রকৃতির অক্সিজেনের ঘনত্ব খুব বেশী, সাধারণের পক্ষে নেওয়া সম্ভবপর নয়। প্রাণায়াম সিদ্ধ যৌগিক সম্প্রদায়ভুক্ত গুরুরা প্রয়োজনে সূক্ষ্মদেহে যেখানে সেখানে যখন তখন যাতায়াত করতে পারেন। অনুরূপ চিন্তা শিষ্যের কল্পনার অতীত।

গুরু-শিষ্যে আর একটি বড় তফাৎ হল মানসিক দুঃখ কষ্ট। শারীরিক দুঃখ কষ্টে বা আত্মীয় পরিবার পরিজন বিরহে ভক্ত-শিষ্যেরা প্রতি মুহূর্তেই ভেঙে যান, পড়ে যান মানসিক দুঃখ কষ্টে। সাধু গুরুদের বেলায় এমনটি ঘটে না। তারা মানসিক অশান্তিতে ভুগলেও তা ক্ষণিকের জন্য—অল্পক্ষণের মধ্যেই তা কাটিয়ে উঠতে পারেন ও সক্ষম হন।

অনেক সময় গুরুর থেকে শিষ্যকে বড় হতে দেখা যায়—এর কারণ প্রাকৃতিক শক্তি, যে শক্তি গুরু বা শিষ্য কারো বশীভূত নয়। যে কোনও বৈদ্যুতিক সংযোগ সংলগ্ন তার থেকে **100 Watt** এবং **40 Watt Lamp** দুই-ই জ্বালানো সম্ভব হয়। যার যেরূপ ক্ষমতা তা সেরূপ শক্তি টেনে নিতে পারে। গুরু শিষ্যের বা ছাত্র শিক্ষকের বেলাতেও তাই। নিজ নিজ কর্মকুশলতার

দ্বারা একই প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে শিষ্যের পক্ষেও গুরুকে ডিঙিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়ে যায়।

চাঁদের বুকে জল — বৈজ্ঞানিক বনাম আধ্যাত্মিক মতবাদ

পৃথিবী থেকে ৩,৮৪,০০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত চাঁদের সৃষ্টি বিশ্বপ্রকৃতির শক্তি থেকেই। এই চাঁদে মানুষের প্রথম পায়ের চিহ্ন পড়েছে বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকের শেষের দিকে। তখন থেকেই শুরু হয়েছে ওখানে পাকাপাকি ভাবে বসবাসের চিন্তা ভাবনা। মার্কিন মহাকাশ যান 'প্রসপেক্টর' থেকে সঙ্কেতে পাঠানো খবরটি সারা বিশ্বে বিজ্ঞানী মহলে ঐ সময় থেকেই আলোড়ন তুলেছে, মানুষের জীবন ধারণের অত্যাবশ্যকীয় 'জল' নামক পদার্থটির সন্ধান মিলেছে চাঁদের বুকে।

চাঁদে কতখানি জল আছে এ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য বিজ্ঞানীরা এখনো দিতে না পারলেও তাদের অনুমান চন্দ্রপৃষ্ঠে জলের পরিমাণ এক কোটি দশ লক্ষ টনের কম নয়। যার দ্বারা আগামী দিনে চাঁদে বসবাসকারী দু'হাজার ব্যক্তির একশ বছর অক্লেশে চলে যাবে। ঐ জল যোগাবে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন—যা যথাক্রমে মানুষের শ্বাস প্রশ্বাস এবং জ্বালানির কাজে সহজ সরলভাবে ব্যবহৃত হবে। বিশ্বের বিশেষ করে মার্কিন বিজ্ঞানীরা নতুন উদ্যমে শুরু করে দিয়েছেন গবেষণা—নেওয়া হচ্ছে প্রস্তুতি, শুরু হয়েছে পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ।

ভারতীয় সাধক সমাজও এখানে বসে নেই। এখানে তাদের মূলধন নিজ নিজ দেহযন্ত্র। ঐ দেহযন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে ভারতীয় দর্শনযোগী দর্শনাচার্য ভীমানন্দ যে কথাটি বলেছেন তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। এখান থেকে যে খবরটি এখনো পর্যন্ত পাওয়া গেছে তা হল—"চাঁদে জল আছে তবে সূক্ষ্ম অবস্থায়, পৃথিবীর জলের মতো স্থূল অবস্থায় মোটেই তা নয়। ঐ জল শুকনো সাদা জমাট বাঁধা শক্ত রবফ। চাঁদে যেহেতু গাছপালা নেই সেহেতু ওখানকার ঐ জল পরিশ্রুত নয়, বরং দূষিত—যার অর্থ প্রাণীকুলের ব্যবহারের অনুপযোগী সৃষ্টির নিয়মেই এমনটি। ঐ জল সূর্যরশ্মি থেকে অতিরিক্ত উত্তাপ গ্রহণ করে পৃথিবীর প্রাণীকুল রক্ষণাবেক্ষণের কাজে সহায়তা করে চলেছে।

এখানে যোগীবর যে আশার বাণীটি শুনিয়েছেন তা হল—চাঁদের বুকে যে জল পাওয়া গেছে তা বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিশোধন করে নিতে পারলে আগামীদিনের মানুষকে বহুবিধ জটিল ব্যাধির হাত থেকে সারিয়ে ফেলা সম্ভব হবে।

দর্শনাচার্যের দর্শন দৃষ্টিতে ধরা পড়া এই তথ্যটি এখনো জনসমক্ষে প্রকাশ পায়নি, যেহেতু প্রামাণ্য রূপে তুলে ধরার ঐ ক্ষমতা কোনও তপস্বীর নেই। এর সত্যাসত্য যাচাইয়ের কাজ বিজ্ঞানীদের, সত্যতা যাচাই করা তাদের পক্ষেই সম্ভব।

চতুর কে?

সাধারণতঃ চতুর অর্থে আমরা তাকে ভাবি, যে বা যিনি অপরের সুখ সুবিধা অগ্রাহ্য করে নানা ছলাকলায় নিজের কাজ গুছিয়ে নেন। ঐ সকল ব্যক্তিরা সমাজের দুর্বলতা বা আইনের ফাঁক-ফোকর সম্বন্ধে সাধারণভাবে খুবই সচেতন থাকেন। কিন্তু এ'রূপ চতুরতায় খুব বেশী লাভ হয় না, যেহেতু এর ফল ক্ষণস্থায়ী।

বস্তুতপক্ষে তিনিই সত্যিকারের চতুর যিনি ক্ষণস্থায়ী ও চিরস্থায়ী চিনতে জেনেছেন, অনিত্যকে বাদ দিয়ে চিরন্তনকে আঁকড়ে ধরেছেন, যা মৃত্যুর পরেও আমাদের সুফল এনে দিতে সক্ষম। চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে এরূপ চতুরের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে—তিনিই প্রকৃত চতুর যিনি কৃষ্ণ ভজনা করেন। যিনি গোবিন্দের স্মরণ নেন।

চিন্তার আরো গভীরে ঢুকে বলা যায় তামাম দুনিয়ায় চতুর বলতে কেবলমাত্র একজনই আছেন। তিনি আমাদের সবাকার সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং ঈশ্বর। তিনিই সব চতুরের রাজা, চতুরের শিরোমণি, কারণ একমাত্র তিনিই বিশ্বচরাচরের সবাইয়ের স্বার্থ পূরণের বন্দোবস্ত করে দিয়ে নিজে স্বার্থশূন্য হয়ে বসে রয়েছেন। সমস্ত কামনা বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, লোভ-লালসা, মায়া-মমতা, হাসি-কান্নার জনক হয়েও তিনি সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে। সমস্ত কিছুইতে হয়ে রয়েছেন নির্লিপ্ত। সমস্ত নিয়মনীতি নিজের সৃষ্ট, তবুও তিনি নিজে এর বেড়াজালে বন্দী ও বাঁধা থেকেও নয়। তার চতুরতার সব থেকে বড় নিদর্শন তার নীরবতা। এই চতুরের শিরোমণিকে যিনি ধরেছেন ও চিনেছেন মানুষের মধ্যে তিনিই সব থেকে বড় চতুর।

জন্মান্তরবাদ

এক জন্ম ছাড়িয়ে অন্য, আগের অথবা পরের জন্ম, জন্মান্তর হিসাবে আখ্যাত। হিন্দুশাস্ত্রে বহুবার বহুভাবে জন্মান্তরের কথা স্বীকার করা হয়েছে। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে অনুরূপ ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। গৌতম বুদ্ধও জাতকের গল্পে তার জন্মান্তরের উল্লেখ করেছেন।

জন্মের শুরু থেকে আমরা একজন অপর একজনের সাথে প্রথম থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে পরিচিত হই নিজ নিজ নামের মধ্য দিয়ে। এই নামকরণের পিছনে বিভিন্ন জনের ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাভাবনা কাজ করলেও প্রতিটি নামের সাথে জন্মান্তরের কোন না কোনও যোগসূত্র বাঁধা থাকে ও আছে, এটি আমরা কেহ জানি না। একমাত্র সৃষ্টির মূলকে জানতে পারলে এর আসল রহস্য উদঘাটন করা সম্ভব, নতুবা নয়। দর্শনাচার্য ভীমানন্দ যোগী মহারাজের থেকে পাওয়া এখানে উদাহরণ সহযোগে কিছু যোগসূত্র তুলে ধরা হয়েছে।

এক জন্মের নাম	অন্যজন্মের (আগের বা পরের) নাম	যোগসূত্র
পশুপতি	শঙ্কর, শিব, গিরিশ	সমার্থক শব্দ
নিমাই	নরেন, নটবর	আদ্য অক্ষর (ন) এক
সৈরভি/কৈকিয়ি	ভৈরবি/দৈবকি	ছন্দের মিল
গুরুপ্রসাদ/অশোক গোপাল	ঈশ্বরচন্দ্র/কেশব গিরিশ	সমসংখ্যক অক্ষর যুক্ত (এখানে ৫টি/৩টি অক্ষর)
কুব্জা	মন্থরা	দেহের গঠন/যুক্তাক্ষর শব্দ
ভীম	গদাধর	অর্থগত মিল
রাম	কৃষ্ণ	দেহের বর্ণ - শ্যামবর্ণ
সীতা	বিষ্ণুপ্রিয়া	কার্যবিধি - জনমদুঃখিনী
রাম লক্ষ্মণ	কৃষ্ণ বলরাম/ গৌর নিতাই	একে অপরের সহযোগী (জোড়)
রামকৃষ্ণ	রামপ্রসাদ	একই পথের পথিক (কালী সাধক)

এই যোগসূত্রের সমস্তগুলি একজনের ক্ষেত্রে হুবহু মিলে যাবে সাধারণতঃ এমন হয় না, তবে এক বা একাধিক যোগসূত্র অতি অবশ্যই মিলে যায়।

একমাত্র একজন ব্রহ্মাজ্ঞের পক্ষেই মিল মিলনের জন্ম বৃত্তান্ত হুবহু বলে দেওয়া এবং বোধে আনা সম্ভব, অন্যদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। এদের মাধ্যমেই একান্ত অনুগত ভক্ত শিষ্য শিষ্যেরা তা জানতে সক্ষম হন কিন্তু কোনও ভাবেই বোধে আনতে পারেন না। যোগীবর শ্যামাচরণ লাহিড়ী চোখে দেখেও তার পূর্বজন্মের সাধন ভজনে ব্যবহৃত দ্রব্য সামগ্রী নিজ বোধে আনতে পারেননি। বাবাজী মহারাজের কৃপাস্পর্শে তা পরবর্তীকালে চিনে নিতে বা বোধে আনতে সক্ষম হন। লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনী থেকে আমরা এই জিনিস জানতে পেরেছি।

এখানে একটি কথা বলে রাখতে হয়—একই শ্রেণীতে পাঠরত বা সহপাঠীদের মধ্যে যার সাথে যত বেশী বন্ধুত্ব বা শত্রুতা তা যেমন দশ/বিশ বছর পরেও সহজেই ধরা পড়ে, তেমনি গুরু ভক্ত শিষ্য যার সাথে যত বেশী যোগাযোগ বা ঘনিষ্ঠতা থাকে, তাকে/তাদেরকে এক জন্ম ছাড়িয়ে পরের জন্মতেও চেনা যায় অন্যান্যদের থেকে অনেক আগে ও সহজে। এখানে যিনি সৃষ্টির মূলকে ধরতে পেরেছেন কেবলমাত্র তার পক্ষেই ধরা সম্ভব।

জ্ঞান কি?

বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতার নাম জ্ঞান। জ্ঞানই হল অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনকে ধরার মাপকাঠি। প্রকৃতিজ জ্ঞানলাভের জন্য শিক্ষার দরকার হয় না। জ্ঞান জন্ম থেকে জন্মায় এবং বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার পরিধি বাড়তে থাকে ও পরিপক্ক হয়।

জ্ঞানের দিবারাত্র নেই, সূর্যের আলোর মতোই পৃথিবীতেই দিনরাত, সূর্যের কাছে আর দিনরাত কই? জ্ঞানও তাই। প্রকৃত জ্ঞান যাদের হয়েছে তাঁদের কাছে দুঃখও যা আনন্দও তাই, কোনও রকম ভেদাভেদ নেই। শারীরিক দুঃখ কষ্ট আছে কিন্তু তা মনকে স্পর্শ করে না। এরা অপার্থিব এক আনন্দে সর্বদা বিভোর থাকেন। কিন্তু অন্যরা বিপথে বা ভুল পথে চালিত হচ্ছে দেখলে নিজেরা বিচলিত হন ও আঘাত পান।

ষট্‌চক্র ভেদে সমাধি বা সিদ্ধিলাভ, ব্রহ্মত্ব জ্ঞান কিন্তু অস্থায়ীভাবে, যেহেতু শরীরে তখনো প্রাণবায়ু থেকে যায়। দেহ থেকে প্রাণবায়ু তাড়াতে পারলেই ঐ ব্রহ্মত্ব পূর্ণতা পায়, হওয়া যায় ব্রহ্মজ্ঞানী। একমাত্র তখনি হয় প্রকৃত বোঝাপড়া, আলোর রাজত্বে স্থায়ীভাবে বসবাস—যৌগিক পরিভাষায় সহস্রায় অবস্থান। সৃষ্টিতত্ত্বের সমস্ত কিছুই এখানে অবগত হওয়া যায়, জানা যায়

অনাদি, অনন্ত, অবর্ণনীয়, অকল্পনীয় ঐশ্বরিক শক্তির মহিমা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাদি।

জ্ঞান সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যা একমাত্র সূচের ডগাতেই ধরা সম্ভব। ষট্‌চক্রভেদের পর একজন সাধকের ঐ পরম ব্রহ্ম পরম জ্ঞান লাভ করতে জীবনের দুই দশকেরও বেশী সময় লেগে যায়।

জ্ঞানচক্ষু বা মনচক্ষু

সৃষ্টির গোপন রহস্য বা অপ্রাকৃত জ্ঞান আমরা যে চক্ষুর দ্বারা পেয়ে থাকি তার নাম জ্ঞানচক্ষু, অবস্থান মানবশরীরের ভ্রূদ্বয়ের মাঝখানে কূটস্থে। আমাদের মুখমণ্ডলে অবস্থিত চোখ দুটির দেখার ক্ষমতা খুবই সীমিত। কেবলমাত্র কাছের এবং স্থূল জিনিসকে ধরতে সে সক্ষম। বিজ্ঞানের দৌলতে বিশেষ বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে ঐ ক্ষমতা বাড়িয়ে দূরের জিনিস এবং সূক্ষ্ম জিনিসকেও ধরা সম্ভব হয়। কিন্তু মানবদেহের কূটস্থে অবস্থিত ঐ একটি চোখের দেখার ক্ষমতা অপরিসীম অনন্ত। যন্ত্র ছাড়াও ঐ চোখের সাহায্যে স্থূল ছাড়িয়ে দূর, দূর ছাড়িয়ে অতিদূর, এমনকি যুক্তি গ্রাহ্যের বাইরের জিনিসকেও ধরতে সক্ষমতা অর্জন করা যায়। এ চোখের কাছে দিবারাত্র নেই, পলক পড়ে না, ঘুম নেই, সর্বদা জাগরিত। এর দৃষ্টি জল স্থল, স্বচ্ছ অস্বচ্ছ, ঊর্ধ্ব অধো কোথাও বা কারো কাছে বাধা পড়ে না, এ চোখে দেখার জন্য অন্যত্র যেতেও হয় না। একই জায়গা থেকে জাগরিত অথবা নিদ্রিত সব সময়েই সমস্ত কিছুই দেখা যায়। এই চোখ দিয়ে দেখার নামই অন্তর দিয়ে দেখা, বা অন্তর্দৃষ্টিতে দেখা।

প্রতিটি মানবদেহের তৃতীয় ঐ চোখের (ত্রিনয়ন) দেখার ক্ষমতা অপরিসীম। তবুও আছে সীমাবদ্ধতা, কারণ মানবদেহের Brain-এর Capacity, বিশ্বের সমস্ত কিছু বা যাবতীয় যা কিছুর নাড়ি নক্ষত্র বা খুঁটি-নাটি ঘটনা ধরে রাখার ক্ষমতা আমাদের এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের নেই বা Capacity-এর বাইরে। এই কারণে এখানেও আছে সুনিয়ন্ত্রিত কৌশল। সৃষ্টির বুকে আমাদের যখন যে জিনিসটি জানানোর দরকার আমাদের বিধাতা পুরুষ একজন সাধকের জ্ঞানচক্ষুতে কেবলমাত্র সেই তথ্যটুকুই ধরিয়ে দেন। এই দেখা অবিকল আমাদের TV-তে দেখা ছবির ন্যায়। কিন্তু ঐ ছবির মধ্যে কোনও বাক্য বা কথা থাকে না, নির্বাক—কেবল দেখা আর দেখা, ওখান থেকেই সাধককে বোঝাপড়া করে নিতে হয়। এ কাজে তাকে সমস্ত রকম সাহায্য করে থাকে আমাদের

আন্তরিন্দ্রিয়গুলো, যার সর্বময় কর্তা আমাদের মন। কাজেই ঐ দেখা মনে দেখা, মনেতেই বোঝপড়া, যে কারণে ঐ জ্ঞানচক্ষুর অপর নাম মনশ্চক্ষু।

জ্ঞানচক্ষুতে সৃষ্টির আলো

কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত হওয়ার পর সৃষ্টির আলো পেতে একজন সাধকের কমপক্ষে ২৭০ থেকে ২৮০ দিন সময় লেগে যায়। এটি ঠিক গর্ভবতী মায়েদের গর্ভে সন্তান ধারণ থেকে প্রসব হওয়ার সময় এবং সমকালীন শারীরিক অস্থিরতার সাথে তুলনীয়। সাধককে ঐ সময় চরম অসহনীয় অবস্থার মধ্য দিয়ে চলতে হয়।

মানবশরীরে প্রাণবায়ুতে যে অক্সিজেন থাকে তার কারণে ষট্‌চক্র ভেদে সৃষ্টির আলো প্রথমে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় লাল দেখায়, এর তীব্রতা অসহনীয়, দেহ রাখা দায় হয়ে ওঠে। সাধন ভজন কালে ভ্রূদ্বয়ের মাঝখানে ঐ আলো (জ্বলন্ত আগুন) হঠাৎ করে দপ করে জ্বলে ওঠে। ছয়/সাত মাস পরে ঐ আলোর তীব্রতা হ্রাস পায় এবং গোলাকার আকৃতির রূপ পায়। ক্রমে ক্রমে ঐ আলো খুবই উপভোগ্য হতে থাকে, যা বিরাট জলাশয়ের স্বচ্ছ জলের উপর মৃদু-মন্দ বাতাসে দেখতে পাওয়া একমাত্র শুভ্র জ্যোৎস্নার সাথেই তুলনীয়। ওখানেই প্রধান প্রধান ঘটনাসমূহ যা একদিন পৃথিবীর বুকে ঘটবে অথবা ঘটে গেছে তা ভাসতে থাকে। সাধককে ওখান থেকেই বোঝাপড়া করে নিতে হয়।

জ্ঞান ও বুদ্ধি

জ্ঞান এবং বুদ্ধি উভয়ের বসবাস একই জায়গায়, আমাদের মানব শরীরের আলোর রাজ্য মস্তিকে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কিছু তফাৎ আছে। বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতার নাম 'জ্ঞান' এবং তা প্রয়োগ করার কৌশলের নাম 'বুদ্ধি'। জ্ঞান প্রত্যক্ষ, বুদ্ধি পরোক্ষ, জ্ঞান সরাসরি জন্মের সাথে জন্মে, কিন্তু শিক্ষার দ্বারা বুদ্ধি ধারণ করতে হয়, চলিত জ্ঞান।

মানুষের বুদ্ধির অংশ চুম্বকের মতো, প্রকৃতির মাধ্যমকে সহজে ধরে নিতে পারে, সেই কারণে বুদ্ধির বিকাশ ঘটিয়ে চুম্বকের ক্ষমতা বাড়িয়ে নিতে হয়। কিন্তু জ্ঞান নিজেই চুম্বক, এর ক্ষমতা পূর্ব নির্ধারিত প্রকৃতি থেকে দেওয়া বাড়ানো বা কমানোর প্রশ্ন নেই। সময়ের সাথে সাথে আপনা-আপনি ফুটে ওঠে।

সাধন ভজনে ব্যবহৃত তিন-তিনের মিল			
এক	দুই	*তিন*	*মিলন সূত্র*
ঈশ্বর	সূক্ষ্ম প্রকৃতি	স্থূল প্রকৃতি	সৃষ্টির কাঠামো
জল	মাটি	বাতাস	পৃথিবীর কাঠামো
রক্ত	মাংস	অস্থি	মানবদেহ কাঠামো
সৃষ্টি	স্থিতি	লয়	সৃষ্টি চক্র
জন্ম	বৃদ্ধি	মৃত্যু	জন্ম-মৃত্যু চক্র
আধ্যাত্মিক	আধিবৈদিক	আধিভৌতিক	ত্রি-তাপ চক্র
ব্রহ্মা	বিষ্ণু	মহেশ্বর	মানবমূর্তির প্রথম প্রকাশে তিন দেবতা
সত্য	ত্রেতা	দ্বাপর	সৃষ্টির প্রথম তিন যুগ
হরি	রাম	কৃষ্ণ	তিন যুগে প্রথম তিন অবতার
প্রাণ	দেহ	মন	সাধন ভজনে ব্যবহৃত দেহের তিন অঙ্গ
কর্মেন্দ্রিয়	জ্ঞানেন্দ্রিয়	অন্তরিন্দ্রিয়	সাধন ভজনে ব্যবহৃত তিন ধরনের ইন্দ্রিয়
ভোর	দুপুর	সময়	সাধন ভজনে ব্যবহৃত দিনরাতের তিন উৎকৃষ্ট সময়
রজঃ	তমঃ	সত্ত্ব	দেহের তিন গুণ
শৈশব	যৌবন	বার্ধক্য	দেহের তিন অবস্থা
ইড়া	পিঙ্গলা	সুষুম্না	প্রাণবায়ু প্রবাহের তিন পথ বা নাড়ী

ত্রিনয়ন

আমাদের মানব শরীরে সাধারণ চোখ দুটির দেখার যা ক্ষমতা তা কেবলমাত্র স্থূল জিনিসকে ধরতে সক্ষম। আলো বিহনে এ চোখে দেখার ক্ষমতা নেই। মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির দ্বারা ঐ দেখার ক্ষমতা অনেকগুন বাড়িয়ে নিয়েছে, ফলে আমরা স্থূল ছাড়িয়ে সূক্ষ্ম, নিকট ছাড়িয়ে দূরের জিনিসকেও ধরতে সক্ষম হয়েছি।

কিন্তু ঐশ্বরিক শক্তি এমনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অথচ ব্যতিক্রম গুণসম্পন্ন যা মানুষের সাধারণ চোখ দুটির দ্বারা বা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতে ধরা সম্ভব নয় বা হয় না। এর জন্য অন্য ধরনের যন্ত্রপাতির দরকার হয় যা বিজ্ঞানের আয়ত্তের মধ্যে এখোনো আসেনি। খুবই আনন্দের কথা ঐ যন্ত্রটি প্রতিটি মানব শরীরে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে তৃতীয় এক চোখ কূটস্থে বর্তমান। চামড়ায় ঢাকা তৃতীয় এই চোখের নাম ত্রিনয়ন। এই চোখের সাহায্য নিয়ে বহু অপ্রত্যাশিত ও অলৌকিক ঘটনা ধরা পড়ে সেই কারণে এর অপর এক নাম দিব্য চক্ষু। ঐ চক্ষুতে দেখার জন্য কোনই আলোর দরকার হয় না। ঐ চোখের দিবারাত্র, নিদ্রা নেই—সর্বদাই জাগরিত। মানবদেহের অভ্যন্তরস্থিত ইন্দ্রিয় সমূহকে বিকশিত করতে পারলে ঐ তৃতীয় চোখের দ্বারা দেখা সম্ভব হয়, তখনি জ্ঞানের পরিধি বিস্তার লাভ করে হয় অপ্রাকৃত জ্ঞান, লাভ হয় জ্ঞানচক্ষু। একমাত্র ঐ ত্রিনয়ন লাভের পরই একজন মানুষের অজ্ঞতা, অন্ধকারত্ব ঘুচে যায়। প্রকৃত সত্যকে জানার বিশেষ এক ক্ষমতা জন্মে। কিন্তু ঐ ত্রিনয়ন লাভের সময় একজন সাধকের জীবনে নেমে আসে ঘন অন্ধকার। এখানে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা স্তব্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়, প্রয়োজনবোধে সাধন ভজন বন্ধ করে সাধককে নেমে আসতে হয়। অনেক সময় দেহপাতও ঘটে যায়। একমাত্র মাতৃস্বরূপা বৃহস্পতির অপার কৃপাবলেই ঐ কঠিন অবস্থা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়ে যায়। তখনি প্রশস্ত হয় পরম তত্ত্ব এবং পরম জ্ঞান লাভের পথ।

কোন কোন মতে মানব শরীরে মুখমণ্ডলে অবস্থিত স্থূল চক্ষু বাদ দিয়ে কপালে কূটস্থে আছে পূর্ব বর্ণিত সূক্ষ্ম চোখ। এ ছাড়াও মাথায় টিকির স্থানে ব্রহ্ম রন্ধ্রে আছে অপর একটি চোখ, যোগশাস্ত্রে বর্ণিত এখানকার নাম সহস্রা। একমাত্র এখানে পৌঁছাতে পারলেই সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য জানা সম্ভব হয়। উহাই ত্রিনয়ন।

ত্রিগুণাতীত

সত্ত্ব রজঃ তমঃ মানবশরীরের এই তিন গুণ যিনি জয় করেছেন অর্থাৎ এই ত্রিবিধ গুণের প্রভাব থেকে যিনি মুক্ত তিনিই ত্রিগুণাতীত নামে পরিগণিত হয়ে থাকেন।

সত্ত্বগুণ—ঈশ্বরে বিশ্বাস ও স্মরণাগতি, —ভক্তি প্রেম ভালবাসা ও ন্যায়নীতি বোধ, সৎ চিন্তা, প্রকৃত সত্যকে জানার ইচ্ছা, উদার মনোভাব, জগতের সকলের এমনকি শত্রুরও মঙ্গল কামনা, সীমিত আহার ও নিদ্রা, সমস্ত কিছুতেই অন্তরঙ্গতা আন্তরিকতা এবং নিয়ম নিষ্ঠায় ভরা—সত্ত্ব গুণীদের লক্ষণ।

রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি, দুঃখ কষ্ট সমস্ত রকম প্রতিকূলতা এমনকি মৃত্যুভয় কাটিয়ে ওঠার জন্য মানুষের এই গুণ বিশেষভাবে দরকার। সবাইকে সমদৃষ্টিতে দেখার দেবসুলভ এই গুণ মানুষকে পরম সত্যের দিকে ধাবিত করে—জ্ঞানীদের গুণ।

রজঃ গুণ—দাম্ভিকতা, জাঁকজমক দেখানো, অহং বোধ, বিলাস বহুল ভোগবাসনায় ভরা জীবন, সম্মানের আকাঙ্ক্ষা, কেবলমাত্র নিজ পরিবার পরিজনাদি নিয়ে আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা, আহার নিদ্রাতেও বিলাসিতা—রজঃ গুণীদের লক্ষণ।

জীবন যুদ্ধে জয়লাভ তথা বড় হওয়ার জন্য এই জেদি গুণের দরকার খুব বেশী। পৃথিবীর জল এবং মানুষের রক্ত রাজসিক গুণের সাথে তুলনীয়। নিজেই সব—এ'রূপ গুণ মানুষকে প্রকৃত সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করে, সহজে এগোতে দেয় না, — আশুরিক গুণ।

তমঃগুণ—উদ্বেগ, অলসতা, বিষণ্ণতা, অবসাদ গ্রস্ততা, কর্মে অনীহা, —মোহ, মনুষত্ব লোপ, ক্ষতির দিকে ধাবিত হয় এমন, উচ্ছিষ্ট বাসী, পচা, উৎকট ঝাল টক মিষ্টি এবং যেখানে সেখানে যখন তখন আহার নিদ্রা তমঃ গুণীদের লক্ষণ।

দুঃসাহসিক কাজ, দৈব-দুর্বিপাক থেকে উদ্ধারে এই গুণের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। নিজে করব না অপরকেও করতে দেব না— এ'রূপ গুণ মানুষকে বিভ্রান্তির দিকে ধাবিত করে— সাধারণের গুণ।

সাধুদের বেলায় —

সত্ত্বগুণ— ঈশ্বরের দিকে ধাবিত করে, ঐ পথ থেকে বিচ্যুত হলে অস্থিরতা বাড়ে।

রজঃগুণ—ঈশ্বরকে যতক্ষণ না পাই দেখে ছাড়ব। এই পথে লেগে থাকতে পারলে ভাল, তবে ধৈর্য রাখা খুবই কঠিন।

তমঃগুণ—ঈশ্বরকে দিনরাত ডাকছি, জপ-তপ-ধ্যান করে চলেছি, কিছুই পেলাম না, আর এ'সব করে কি হবে, এ'রূপ মোহগ্রস্ততা ঈশ্বরীয় পথে বাধার সৃষ্টি করে দেয়। তবে জন্ম-জন্মান্তরের প্রচেষ্টায় লেগে থাকতে পারলে এই ভাব বা এই গুণও কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়।

ঠাণ্ডা ও তাপ কি?

তাপ অর্থে আমরা সবাই উষ্ণতা বুঝে থাকি, শীতলতা ভাবি না। বাস্তবে ঠাণ্ডা তাপ বলে কোন কিছু নেই, কিন্তু আছে যুক্তিতে—আছে যুক্তির ভাষার মধ্যে ধরা। যে তাপে শরীরে উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় না, কিন্তু তাপের অনুরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে থাকে উহাই ঠাণ্ডা তাপ। বাড়ীতে সদ্য মিল করে যাওয়া কোনও এক অংকের উত্তর যদি পরীক্ষার সময়ে মেলাতে না পারা যায় তা যেমন মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে বিরাট চাপে অস্থিরতার সৃষ্টি করে কিন্তু শরীরে কোনও তাপের উদ্ভব হয় না, অনুরূপ জিনিসই ঠাণ্ডা তাপ নামে অভিহিত। এর জ্বালা সাধারণ তাপের থেকে বহুগুণ বেশী।

ক্রিয়াযোগ পদ্ধতিতে ষট্‌চক্র ভেদে কূটস্থে ভাসতে থাকা একদিকে লোভনীয় অপরূপ পলক রহিত নৈসর্গিক শোভা বারংবার দেখতে চাওয়া, অন্যদিকে আমাদের মাথা তথা Brain-এর সীমিত ক্ষমতা মানবদেহে যে অসহনীয় অস্থিরতার সৃষ্টি করে থাকে উহাই সাধকদের কাছে ঠাণ্ডা তাপ নামে কথিত হয়েছে।

মানবদেহ

ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চভূত নিয়ে এই মানবদেহ। মানবদেহের দুটি অংশ প্রাণ ও মন। প্রাণের প্রভাব শরীরের নিম্নাঙ্গে এবং মনের প্রভাব উর্ধ্বাঙ্গে ঘটে থাকে। আমাদের পা দু'টি মানবদেহ কাঠামোটিকে ধরে রেখেছে—চলন গমনে সাহায্যকারী হিসাবে। দেহের দরকার সাধন ভজনের জন্য, দেহের ভোগ আছে তাই বাড়া কমাও আছে।

ক্ষিতি, অপ্ এবং মরুৎ অর্থে যথাক্রমে মাটি, জল ও বাতাস। পৃথিবীর এই তিন উপাদনের গুণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ক্রমান্বয়ে মাংস, রক্ত এবং অস্থি বা মজ্জার সহযোগে মানবদেহে শক্তির অংশ প্রাণ, অন্যদিকে ব্যোম ও তেজঃ অর্থে সৌরজগতের যথাক্রমে আকাশ ও তার তেজোময় শক্তি এই নিয়ে মানবদেহের পরিচালন শক্তি তথা মনের কাঠামো।

দেহ যন্ত্রস্বরূপ, তেল বিহনে যেমন যন্ত্র চালু করা যায় না, অচল, তেমনি প্রাণ বিহনে এ দেহযন্ত্র অকেজো তথা জড়। আমরা প্রকৃতির যন্ত্ররূপে পৃথিবীর বুকে মানবদেহ পেয়েছি, আমাদের কাজ মনকে কাজে লাগিয়ে প্রকৃতির প্রতিটি জিনিসকে সুন্দরতর থেকে সুন্দরতম করে গড়ে তোলা এবং সমাজ জীবনে কাজে লাগানো।

দেহকাঠামো গঠনে বাবা এবং মা উভয়েরই হাত। এদের থেকে আমরা যথাক্রমে বীজ এবং ক্ষেত্রের গুণ পেয়ে থাকি। জাতে পুঁটি মাছ অনুকূল পরিবেশে বড় জলাশয়ে ছেড়ে দিয়েও বীজগত গুণে রুইমাছ হবে না। অপর দিকে বড় রুইমাছ পচা পুকুরে ছেড়ে দিয়েও ক্ষেত্রের কারণে বাঁচতে পারবে না। উৎকৃষ্ট ফসলের জন্য উৎকৃষ্ট মানের বীজ এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রের দরকার অবশ্যম্ভাবী। এর পরেও আছে পরিবেশ পরিজনের কথা। উৎকৃষ্ট দেহযন্ত্রের জন্য এসবের প্রয়োজন অতি অবশ্যম্ভাবী। বাবা ও মায়ের থেকে আমরা যথাক্রমে বীজ এবং ক্ষেত্রের গুণ পেয়ে থাকলেও মূলে আছে সৌরলোকের গ্রহ ও নক্ষত্রাদির প্রভাব।

মানবদেহের যা কাঠামোগত ছয় রিপুর গুণ বা প্রবৃত্তি তার প্রতিফলন ঘটবেই, একে কোনওভাবে রোধ করা যাবে না। রামচন্দ্র সীতা বিরহে কেঁদেছেন, শাজাহান তাজমহল নির্মাণকারীদের আঙুল কেটে নিয়েছেন, গৌরাঙ্গদেবও ক্রোধ সংবরণ করতে পারেননি। প্রতিটি মানবদেহের কাঠামোগত গুণ এমনি যে সে অল্প শ্রম, সময় এবং সম্পদের বিনিময়ে পর্যাপ্ত সুখ সম্পদ ভোগ করতে চায়। পেতে চায় যশ মান সুখ্যাতি, লোভ মোহ মাদকতা প্রভৃতিতে সহজেই আসক্ত হয়ে যায়। নিজ পরিবার পরিজন ছাড়িয়ে মানুষ অন্যরে কোন কিছুই সহজে দিতে চায় না, সব কিছু আঁকড়ে ধরতে চায়। আজকের সমাজের বুকে পরস্পরের দ্বেষ, হিংসা, খুনোখুনি এবং অস্থিরতার মূল কারণ ভোগ-লিপ্সা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ যার পিছনে আছে মানবদেহের কাঠামোগত এই প্রাকৃতিক গুণ।

মানবদেহের তিন গুণ

সৃষ্টির উষাকাল থেকে মানুষ গুণ তথা গুণীর পূজারি। সূর্য চন্দ্র নদ-নদী গাছপালা যেখানে বা যার থেকে মানুষ উপকার পেয়েছে সেখানে বা তারই সে পূজা করেছে। রূপের মোহে মানুষ আকৃষ্ট হয়েছে কিন্তু ক্ষণিকের জন্য। গুণই সব, অভাবে মানুষ দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। গুণ আসে জ্ঞান থেকে, তা পুঁথিগত বিদ্যা দ্বারা অর্জিত (পণ্ডিত) অথবা প্রকৃতিজ (জ্ঞানী) যেকোনও

জায়গা থেকে আসতে পারে। তবে একক কোনও ব্যক্তি পণ্ডিত এবং জ্ঞানী এইরূপ দুই গুণের সমান অধিকারী হতে পারেন না। খেলাধূলা এবং পড়াশুনা উভয়ক্ষেত্রে সমান পারদর্শিতা অর্জন করা—এ জিনিস বাস্তবে সম্ভব নয়, এরূপ চিন্তা সৃষ্টির নিয়মের পরিপন্থী চিন্তা। রামকৃষ্ণদেবের পড়াশুনা ছিল না, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ দেখেননি, কিন্তু তিনি বিরাট গুণ, বিশেষ জ্ঞানের ভাণ্ডারী ছিলেন।

পৃথিবীর কাঠামোর অনুকরণে জলের রজঃগুণ মানব শরীরে রক্তের মধ্যে, মাটির তমোগুণ মানবদেহে মাংস পিণ্ডের মধ্যে এবং বাতাসের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সত্ত্বগুণ মানবদেহে প্রাণবায়ুর মধ্যে বিদ্যমান।

পৃথিবীর জল এবং মানবশরীরের রক্ত উভয়েই তরল সৃষ্টির মূল, উভয়ের স্বভাব রাজসিক গুণসম্পন্ন। জলে প্লাবন আসলে সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়, কোনও বাধাই মানে না আবার জল অভাবে ধু-ধু করা মরুভূমি। অনুরূপভাবে মানবদেহ। যৌবনে রক্তের গরমে সমস্ত কিছু বড়াই দম্ভ, সবেতেই "হাম বড়ো" ভাব, রক্তের টান পড়লে বা তেজ কমলেই অর্থাৎ বার্ধক্যে সব শেষ।

মাটির অনুরূপ গুণাবলী মানুষের দেহকাণ্ড মাংস পিণ্ডে তমোগুণরূপে বর্তমান। কঠিন মাটি এবং মানুষের মাংসের শরীর উভয়েরই আদিরূপ তরল, তরল থেকে উৎপত্তি এবং তরলেই নিষ্পত্তি। মাটি জলেতেই দ্রবীভূত আবার মানবদেহও মৃত্যুর পর পচে গিয়ে জল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামা কাপড় যেমন মাটির সংস্পর্শে ধূলি ধূসরিত মলিন হয়ে যায় অনুরূপভাবে মাংসের আস্তরণে ঢাকা মানব শরীরও—আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনা বাসনা সম্পদ সুখ ভোগ করার লালসে শুদ্ধ মনে কালিমা লেপন করে দেয়।

বাতাস বায়বীয় পদার্থ। উৎপত্তি জল থেকে আবার নিষ্পত্তি জলেতেই। পৃথিবী বায়ুমণ্ডলের আবরণে ঢাকা। মানুষের শরীরও তাই, ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিন নাড়ীর সহযোগে প্রাণবায়ু দিয়ে ভরা। বাতাস বিহনে পৃথিবী বা মানুষ উভয়েরই অস্তিত্ব বিপন্ন, মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যু অবধারিত। প্রতিটি মানব শরীরে এই তিন গুণের প্রভাব বর্তমান, কিন্তু সমানভাবে নয় — যেখানে একটির প্রভাবে অন্যটির আপনা-আপনি কমতে থাকে। এই গুণগুলিকে কম-বেশী কাজে লাগিয়ে একজন প্রবল পরাক্রমশালী রাজা মন্ত্রী রাজনৈতিক দাদা মস্তান উচ্চাভিলাষী বা অন্য কিছু, অন্যজন ঈশ্বরাভিমুখী, সহজ সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত ও খুশী। আবার অন্য কেহ ভোগ্য সম্পদ উচ্চ কামনা বাসনায় আসুরিক চিন্তায় নিমগ্ন।

এই গুণত্রয় সৃষ্টির সমতার (Balancing) সূত্র ধরে তৈরি এবং সমসূত্রে বাঁধা। আমাদের সমাজ সুন্দর জীবন গঠনে সত্ত্ব রজঃ এবং তমঃ এই ত্রিবিধ গুণাবলী সম্পন্ন পৃথক পৃথক ব্যক্তির প্রয়োজন অতি অবশ্যম্ভাবী। যে কোনও একের অবর্তমানে সমাজ জীবন অচল ও পঙ্গু। মানুষের মধ্যে তামসিক গুণ থাকার কারণে আমরা বাড়ীর আনাচে কানাচে বা রাস্তা ঘাটে বিষধর সাপ অথবা হিংস্র পশুজন্তু বধ করে বেঁচে আছি। রাজসিক গুণ থাকার ফলে বিভিন্ন সুরুচিসম্পন্ন যেমন উচ্চ কারুকার্য সমন্বিত অট্টালিকা বা স্মৃতিসৌধের ন্যায় অনেক কিছু বানাতে বা তৈরি করতে পারি। আবার সাত্ত্বিক গুণ থাকার কারণে একজন অন্যজনের বিপদে আপদে পাশাপাশি দাঁড়াতে পারি, দিতে পারি সঠিক পথের হদিশ—ঠিক ঠিকানা ও সু-পরামর্শ।

যা আছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তা আছে দেহভাণ্ডে

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরে একদিকে সৌরজগৎ অপরদিকে পৃথিবীর জীবকুল। এই উভয়ের মধ্যে যে যোগসূত্র তথা কৌশল লুকিয়ে আছে তা প্রতিটি মানবশরীরে বর্তমান। কাজেই আমাদের মানবদেহকে Research করতে পারলে এর সবটাই জানা হয়ে যাবে বা জানা সম্ভব।

মানবদেহে মস্তিষ্কই হল পরিচালন ক্ষেত্র, এই হল সৌর জগৎ—এখানেই সূর্য চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহাদির অবস্থান। আমাদের কপালে যে ৬টি ভাঁজ আছে তা সূর্যের বিচরণ ক্ষেত্র। মাঝখানে একটু গর্ত যা সূর্যের উৎপত্তিস্থল। এই উৎপত্তিস্থলকে কেন্দ্র করে সূর্য উপরের দিকে এবং নীচের দিকে সমান মোট ১২ পাকে চক্রাকারে ঘূর্ণন শেষ করে থাকে, যা পৃথিবীর বুকে ১২ মাস সময়ের সমান।

আমাদের মাথায় যে কোষ বা গ্রন্থিগুলো আছে তা গ্রহাদির কাজ করে চলেছে। মানবদেহে সৌরলোকের প্রভাব কপালের ভাঁজ এবং হাতের রেখাতে পড়া যায়।

সৌরলোকে কোনও জল নেই, আমাদের মস্তিষ্কতেও তাই। জল আছে আমাদের পেটে, এখানেই পৃথিবীর অবস্থান।

পৃথিবী যে গতির দ্বারা সূর্যের সাথে যোগসূত্রে বাঁধা আছে তা জানতে নিজ দেহের গতিকে জানলেই হবে। মানবদেহে শ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যে ঐ গতির সূত্রটি ধরা আছে। বিজ্ঞানীদের পক্ষে এর সত্যাসত্য যাচাই করে নেওয়া সম্ভব।

মানবদেহের পেট ও মাথা যথাক্রমে পৃথিবী ও সূর্যের সম্পর্কের অনুরূপ কাজ করে চলেছে। একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ ব্যক্তির পেটের সাথে মাথার

আয়তনের (পরিধির) যা অনুপাত ঐ সমান অনুপাত পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে বর্তমান। পেট যোগাচ্ছে শক্তি, মাথা পরিচালক— পৃথিবী ও সূর্যের বেলাতেও তাই।

জীবকুল সৌরলোক দ্বারা পরিচালিত, যার সর্বময় কর্তা সূর্য। সৌরলোক বায়ুশূন্য, এখানে কোনও বাতাস নেই, এই কারণে সাধন ভজনের বিশেষ কৌশলে মানবদেহকে বায়ুশূন্য করে নিতে পারলে জীবের জন্ম-মৃত্যু রহস্যের পুরোটাই জানা হয়ে যায়। আমাদের বিজ্ঞান এ'সব নিয়ে এখনিCulture করতে পারে।

দেবভূমি — ভারতভূমি

মহাবিশ্বে পৃথিবী নামক এই গ্রহটির উৎপত্তিস্থল হল আমাদের এই ভারতভূমি। দুই বাঙলার বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চল সমূহই হল এর কেন্দ্র তথা কেন্দ্রভূমি।

এখানকার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ, এখানেই একমাত্র গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত ও বসন্ত এই ছয় ঋতু বর্তমান। ফুল ফল জল বন জঙ্গল নদ-নদী সমভূমি মরুভূমি মালভূমি পাহাড় পর্বত দিয়ে ঘেরা সাধন ভজনের এমন অনুকূল পরিবেশ তামাম বিশ্বে আর কোথাও নেই। সাধন ভজনের এমন পীঠস্থান এই উর্বর ভারতভূমি সেই কারণে সৃষ্টির উষাকাল থেকে সাধকদের কাছে দেবভূমি হিসাবে পরিগণিত হয়ে এসেছে।

এখানেই অনন্ত শয্যায় শায়িত হয়েছেন স্বয়ং শ্রীহরি নারায়ণ, একত্রে সমাবেশ ঘটেছে সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়ের তিন দেবতার। আবির্ভূত হয়েছেন ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলিযুগে যথাক্রমে রাম, কৃষ্ণ এবং গৌরাঙ্গ তিন যুগাবতার। এসেছেন মহাবীর, গৌতম বুদ্ধ, আচার্য শঙ্কর, শুকদেব, মহামুনি ব্যাস, পরাশর, মহর্ষি বাল্মীকি, বিশ্বমিত্র, বশিষ্ট, গর্গ, তৈলঙ্গস্বামী, দুর্বাশা, বাবাজি মহারাজ প্রভৃতি সাধু মুনি ঋষি মহাপুরুষগণ থেকে শুরু করে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি সতী সাধ্বীর দল। এই দেবভূমি ভারতভূমি থেকে সমস্ত বিশ্বকে আধ্যাত্মিকতার বাঁধনে বেঁধে দেওয়া অতি সহজেই সম্ভব যা অন্যত্র থেকে এতখানি সহজে সম্ভব নয়।

ভারতের বুকে এতো দেবদেবী— কারণ কি?

ভারতের দেব-দেবী অসংখ্য অগুনতি, বিশ্বের অন্য কোনও ধর্মে বা সম্প্রদায়ের কাছে এমনটি নেই বা দেখা যায় না।

আমাদের ভারতভূমিই হল প্রাকৃতিক মাতৃযোনী, এই হল প্রকৃতির দ্বার, এখান থেকেই পৃথিবীর উৎপত্তি তথা জন্ম। প্রকৃতিগত এই কারণেই এখানকার

জনমানসে গড়ে উঠেছে ঈশ্বর দেব-দেবীর উপর অগাধ বিশ্বাস। এই বিশ্বাস এমনি গাঢ় যে এখানকার জনগণ মাটির তৈরি পুতুল প্রতিমাকে ঈশ্বর দেব-দেবী জ্ঞানে পূজা করে। ঠাকুর খায় না, কি পরে না চোখে দেখেও নিজের মনের সেরা জিনিসটি ফুল ফল দুধ মিষ্টি দিয়ে তার পূজার নৈবেদ্য সাজায়, ধুতি শাড়ি পরিয়ে দেয়। একমাত্র এখানেই নারীজাতিকে এখনো মাতৃ সম্বোধনে সম্ভাষিত করা হয়ে থাকে, যা বিশ্বের অন্যত্র ভোগ্যবস্তু হিসাবেই পরিগণিত।

ভারতের বুকে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব শীতলা কালী দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী সন্তোষী বনবিবি মনসা প্রভৃতি অসংখ্য দেবদেবী থাকার পিছনে রয়েছে এই প্রগাঢ় বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের জোরেই যেখানে মানুষ উপকার পেয়েছে, যার মধ্যে গুণ দেখেছে সেখানে তার পূজা করেছে, দিতে চেয়েছে যথাযথ মর্যাদা তথা যোগ্যতার পূর্ণ স্বীকৃতি। এইভাবেই এখানকার জনমনে গড়ে উঠেছে অগণিত দেব-দেবী। তা হলেও সব ধর্মের যা অভিব্যক্তি সবার মূলে সেই যে একই ঈশ্বর তা থেকে তারা এক চুলও সরে আসেনি।

দীক্ষা

শিক্ষার সাথে দীক্ষা কথাটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শিক্ষার দ্বারা যেমন আচার আচরণের পরিবর্তন ঘটে, তেমনি দীক্ষার দ্বারা মানুষের মনের স্বভাবের পরিবর্তন ঘটে থাকে। দীক্ষার উদ্দেশ্য পথ প্রস্তুতি। দীক্ষার প্রয়োজন একজনকে অনুপ্রেরণা দেওয়া এবং ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে দেওয়া। হাতে-খড়ির মধ্য দিয়ে একজন শিশুর যেমন বিদ্যারম্ভের সূত্রপাত অনুরূপভাবে দীক্ষার মধ্য দিয়েই একজনের জীবনে ঈশ্বর ভজন জপ তপ ধ্যানের সূচনা।

দীক্ষার দুই দিক। দীক্ষা গ্রহণ বা দীক্ষা নেওয়া এবং দীক্ষা প্রদান বা দীক্ষা দেওয়া ।

দীক্ষা নেওয়ার জন্য কোনও আশ্রম বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে বেছে নেওয়া যুক্তিযুক্ত। তবে এখানে একটি জিনিস মনে রাখা ও খুব বেশী ভেবে দেখার দরকার যা হল—একজন ভাল শিক্ষক ক্লাসে ভাল পড়ান কিন্তু যখন তখন অনুপস্থিত থাকেন এরূপ শিক্ষকের দ্বারা পড়াশুনাতে যেমন ভাল কাজ হয় না, অথবা দানসূত্রে পাওয়া দশ/বিশ একর জমির এক মালিক লোকবল বা অর্থ অভাবে যেমন ঐ জমি কোনও কাজে লাগাতে পারেন না তেমনি বিরাট বড় প্রতিষ্ঠান হাজার হাজার ভক্ত শিষ্য শিষ্যার দল কিন্তু নিজের বিপদে আপদে কি চরম দুঃসময়ে গুরুর পরামর্শ নেওয়ার সুযোগ মেলে না—এরূপ

আশ্রমে দীক্ষা না নেওয়াই ভাল। এখানে প্রয়োজনে কোন গৃহী গুরুর থেকে দীক্ষা নেওয়া মোটেই ক্ষতিকারক নয়। পরিবারের সমস্ত সদস্য বিশেষতঃ স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই আগে পরে হলেও একই জায়গা বা আশ্রম (সম্ভব থাকলে একই গুরুর) থেকে দীক্ষা নেওয়া যুক্তিযুক্ত। এখানে সংসারযাত্রা নির্বাহে উপকার পাওয়া যায় খুব বেশী। ভিন্ন ভিন্ন গুরু বা আশ্রমে এ কাজ হয়ে থাকলে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের মতের মিলে ঘাটতি দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মতান্তর ঘটে থাকে—যা পরবর্তীকালে সংসার এবং সন্তান সন্ততির উপর প্রভাব ফেলে দেয়।

পড়াশুনার ক্ষেত্রে আরো এগিয়ে যাওয়ার জন্য যেমন এক শিক্ষক ছেড়ে অন্য শিক্ষকের সাহায্য নিতে হয় তেমনি আধ্যাত্মিক জগতে আরো বোঝাপড়ার পরিধি বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনে এক গুরু ছাড়িয়ে অন্য গুরুর স্মরণ নিতে হয়। এখানে আগের গুরুর মনে কোনও মান অভিমান ক্ষোভ বা রাগারাগির ব্যাপার থাকা উচিত নয়। এসব ক্ষেত্রের পরের জনকে দীক্ষাগুরুর পরিবর্তে শিক্ষাগুরু হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

দীক্ষা অর্থে ইষ্টমন্ত্র দান, ক্ষেত্রে বীজ প্রয়োগ। কিন্তু পাথরে বীজ পড়লে বা নিক্ষেপ করলে যেমন অঙ্কুরোদ্‌গম ঘটে না, তেমনি অনুর্বর ক্ষেত্র বা অপাত্রে দীক্ষাদানে কাজের কাজ কিছুই হয় না। এর জন্য দীক্ষাদানের পূর্বাহ্নে গুরুর উচিত ক্ষেত্র নির্বাচন করে নেওয়া, প্রয়োজনে ক্ষেত্র তৈরি করে নেওয়া।

আজ কোন কোনও আশ্রম বা একশ্রেণীর সাধুর মধ্যে দীক্ষা অর্থাৎ শিষ্য শিষ্যার সংখ্যা বাড়িয়ে নেওয়ার প্রবণতা লক্ষণীয়, কিন্তু কোনও গুরু বা আশ্রমের নিজস্ব ক্ষমতার বাইরে অর্থাৎ শিষ্য শিষ্যার বিপদে আপদে কাছে দাঁড়াতে না পারলে এদের সংখ্যা বাড়িয়ে নেওয়া মোটেই কামনীয় নয়। এর দ্বারা আশ্রমের Income বাড়ে কিন্তু মূল কাজের কিছুই হয় না।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে একটি কথা বলা খুবই প্রয়োজনীয় যেটি হল আমাদের অনেকেরই ধারণা আছে যে গুরু অন্য জগতের লোক, তার কাছে কোনও গৃহীর গৃহের বা নিজের সমস্যার কোনও কথা বলা উচিত নয়। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল, সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। —তা হলে দীক্ষা নেওয়ার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। দীক্ষা নেওয়ার একটি প্রধান উদ্দেশ্য আমাদের রোগে শোকে বিপদে আপদে গুরুর সু-পরামর্শ নেওয়া। এখানে গুরু দেবেন শান্তির বারি, —সাধন-ভজন-জপ-তপ-ধ্যান এসব অনেক পরের কথা।

ধ্যান

দৈনন্দিন জীবনে ঘাত প্রতিঘাতে চলতে গিয়ে আমাদের মন অস্থির হয়ে ওঠে ও বিক্ষিপ্ততায় ভরে যায়। এই অস্থিরতা কাটিয়ে ওঠার পথটি হল নিয়মিত ধ্যান অভ্যাস করা। ধ্যান করার উদ্দেশ্য মনের একাগ্রতা বাড়ানো, মনকে বহুমুখী দিক থেকে একমুখী করা, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়া।

ধ্যানে অভিনিবেশ সহকারে গুরুকে স্মরণ মনন চিন্তন করতে হয়। ভ্রূদ্বয়ের মাঝখানে অথবা হৃদয় কমলে (বক্ষস্থলে) ফুটিয়ে তুলতে হয় গুরুর সৌম্যমূর্তি। গুরুর অভাবে ঈশ্বর, ঈশ্বরে অবিশ্বাসে পিতা মাতার স্মরণ নিলেও ক্ষতির কিছু থাকে না। ধ্যানের দ্বারা মানব মনে অন্তর্নিহিত শক্তির বৃদ্ধি ঘটে, অন্তর বিকশিত তথা প্রস্ফুটিত হয়।

পঠন পাঠনের জন্য যেমন স্কুল কলেজের শান্ত পরিবেশের দরকার হয়ে যায়, ধ্যান করার জন্য তেমনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যতখানি সম্ভব নির্জন জায়গা বেছে নিতে হয়। পরিধানে পরিষ্কার ল্যাঙট বা কোপীন, ছিমছাম বিশেষতঃ সাদা বা গেরুয়া পোশাক ধ্যানে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে থাকে। কম্বল বা অনুরূপ আসনে মেরুদণ্ড সোজা রেখে চোখ দুটি বন্ধ করে গুরুপদে মন নিবিষ্ট করা ধ্যানের অঙ্গ ও পদ্ধতি। প্রতিদিন, দিন ও রাত্রির তিন মিলন ক্ষণ বা তিন সন্ধ্যা—ভোরবেলা, দুপুর এবং সন্ধ্যাবেলা ধ্যান করার উপযুক্ত সময় হিসাবে নির্ধারিত হয়ে থাকে। সময়াভাবে সকাল ও সন্ধ্যায় ধ্যানে বসা যেতে পারে। খুব শীত এবং অত্যধিক গরমের ন্যায় ভরা ও খালি পেট ধ্যানের কাজে ব্যাঘাৎ সৃষ্টি করে থাকে। এ ছাড়াও অত্যধিক পরিশ্রম বা ক্লান্তি, পায়খানা ও প্রস্রাবের বেগ ধারণ, ধ্যানে ব্যাঘাৎ সৃষ্টি করে থাকে।

ধর্ম কি?

মানব জীবনের চতুর্বিদ লক্ষ্য—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এগুলির মধ্যে ধর্মের সংজ্ঞা বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ও সময়ে দিয়ে গেছেন। কিন্তু সকলের ব্যক্তব্যের মূলে আছে একটি জিনিস, তা হল ধর্ম অর্থে ধারণ করা।

প্রকৃত পক্ষে ধর্ম হল বাস্তব চেতনা। যেখানে আমাদের সমাজ ও সামাজিক জীবনে ন্যায়গত কাজ সমূহ ধর্ম এবং এর বিপরীতমুখী কাজ সমূহ অধর্ম নামে চিহ্নিত বা পরিগণিত হয়ে থাকে। মন্দির মসজিদে যা করা হয় তা আনুষ্ঠানিক ধর্ম।

লোহা কিংবা চুম্বক কেউ কাউকে টানে না, পরন্তু যে জিনিসটি উভয়কে সমসূত্রে ধরে রাখে তা হল তাদের প্রাকৃতিক ধর্ম। এইভাবে সৃষ্টিতে স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় যা কিছু যে কৌশলে ধরা আছে তাহাই ধর্ম। সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্যন্ত এই জিনিসটি অক্ষত অবস্থায় আছে, সামান্যও ভাঙাভাঙি হয়নি। একদিকে স্রষ্টা অন্যদিকে তার সৃষ্টির প্রতিটি জিনিস উভয়ের মধ্যে যোগ বন্ধনকারী মিলন সেতুটি আজও ঐ প্রাকৃতিক তথা ধর্মীয় নিয়মে দৃঢ়ভাবে বাঁধা, যেখানে পূজা-আচার-যাগ-যজ্ঞ-ধ্যান-তপ-জপ এগুলি এর অনুশীলন মাত্র।

আমাদের সব সময় মনে রাখার দরকার আমরা ধর্ম অর্থে পূজা-আচার ঈশ্বর দেব-দেবী পুরাণ শাস্ত্রাদিতে বিশ্বাস করি বা না করি ক্ষতি নেই, কিন্তু আমাদের সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকা তথা জীবন ও জীবিকার জন্য যদি প্রাত্যহিক কর্ম না করি তাহলে আমাদের সমূহ ক্ষতি। একমাত্র কর্মই সমস্ত জীবকুলের সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার মূল ধর্ম, এও ঈশ্বরীয় নিয়মেই তৈরি। এ ধর্ম না মানলে বা না পালন করলে আমাদের ক্ষতি অবধারিত ও অবশ্যম্ভাবী।

ধর্মের প্রয়োজনীয়তা

আমরা যতদিন একাকী ছিলাম ততদিন ধর্মের প্রয়োজন ছিল না। যখনি এক থেকে দুই, দুই থেকে চার এরূপ ক্রমান্বয়ে একের বেশী বহুতে এলাম তখনি আমাদের কথাবার্তা, আচার-আচরণ, খাওয়া দাওয়া, চিন্তাভাবনা এবং মতাদর্শ ইত্যাদির সমস্ত কিছুতেই এসে গেল বিভিন্নতা। এই বিভিন্নতাকে একই সূত্রে তথা সমসূত্রে বেঁধে বা ধরে রাখার প্রয়োজনে দরকার হয়ে গেল ধর্মের। এই ধর্মের প্রয়োজন আরো বেড়ে গেল যখন পৃথিবীর জন সংখ্যা হাজার হাজার কি লক্ষ লক্ষ ছাড়িয়ে কোটি কোটিতে পৌঁছে গেল। সুতরাং আমাদের দেহকাঠামোগত গুণে যে বিভিন্নতা, সেই বিভিন্নতাকে সঠিক পথে ধরে রাখার জন্য ধর্মের প্রয়োজন আছে এবং চিরদিনই থেকে যাবে। এর জন্য কেবল যেটুকু অবলম্বন করার দরকার তা হল ধর্মের নামে গোঁড়ামি, অন্ধত্ব, কুসংস্কার সমূহকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া, এতেই আসবে আমাদের সমাজ জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি।

ধর্মের সব থেকে বেশী প্রয়োজন পৃথিবীতে কেহ বা কোন কিছুই ফেলনার নয়, প্রত্যেকেরই কোন না কোনও, কোথাও না কোথাও প্রয়োজন আছে এই বোধটুকু আনার জন্য—অর্থাৎ মনুষ্য জীবনে মানবজাতির সব থেকে বড় ধর্ম পালন করার জন্য।

পৃথিবীতে বহু ধর্ম প্রচলিত — লাভ কি?

বহুমুখী থাকা মানেই বিভিন্ন দিক খুলে যাওয়া। বিভিন্নতা মানেই পারস্পরিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্র বেড়ে যাওয়া। বহু থাকার সুবিধা হল তাদের থেকে সঠিক সত্যটি বেছে নেওয়া।

ধর্মে বিভিন্নতা বা বিভিন্ন ধর্ম থাকার মূল উদ্দেশ্য হল একটিই, যেটি হল—সব ধর্মেরই মূলে যে একই পরম ব্রহ্ম পরমেশ্বর এই সত্যটি:বুঝিয়ে দেওয়া। বিভিন্ন ভাষায় ভগবান, আল্লা, God যা বলি না কেন সবার মূলে একই ঈশ্বর। সারা বিশ্ব, কেবলমাত্র একটি প্রচলিত ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হলে এ জিনিস এত সহজে বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না।

ধর্মীয় অনুষ্ঠান সমূহের প্রয়োজনীয়তা

কোটি কোটি বছর আগে পৃথিবীর বুকে যে প্রাকৃতিক নিয়মকানুন ছিল আজও সেই একই নিয়মনীতি চলে আসছে, তার এক চুলও হেরফের ঘটেনি বা এপাশ ওপাশ কি এদিক ওদিক হয়নি, কেবল আমি তুমি আমরা বারে বারে ভেঙে যাচ্ছি। এই কারণেই আর পাঁচটি অনুষ্ঠানের মতো বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে এই জিনিসটি অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়ম কানুন ধরিয়ে দিতে হয়।

বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা ধর্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা ও উদ্দেশ্য জানতে পারি। ধর্মের নামে কুসংস্কার, গোঁড়ামি, অন্ধত্ব, অজ্ঞতা, অন্ধকারত্ব কাটিয়ে ওঠার পথ পেয়ে থাকি। আমরা জানতে পারি সৃষ্টির নিয়ম নীতি, আমরা আরো জানতে পারি কোন্‌টি স্থায়ী কোন্‌টি অস্থায়ী অর্থাৎ কোন্‌টি করা উচিত কোন্‌টি নয়। এখানেই জানতে পারি আমরা মানুষ তথা জীবকুল অস্থায়ী কিন্তু যে নিয়মের অধীন আমাদের জন্ম-বৃদ্ধি-মৃত্যু ভোগ বাসনা কামনা আশা আকাঙ্ক্ষার সমস্ত কিছু তা স্থায়ী, কোনটাই অস্থায়ী নয়। আমাদের দরকার ঐ নিয়মনীতি অনুধাবন করে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ভাব ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া।

বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা আরো জানতে পারি আমাদের ত্রিপিটক, কোরান, বাইবেল, বেদ, পুরাণাদিতে বর্ণিত বিভিন্ন মহাত্মন, মহাজ্ঞানী ও মহাজনদের কথা, যারা মানুষের জীবনধারাকে সুপথে প্রবাহিত করার পথ নির্দেশিকা দিয়ে গেছেন। বলে গেছেন 'জীবে প্রেম' করার কথা, বলে গেছেন ''সংসারে থাকতে হবে পাঁকাল মাছের মতো'' বলে গেছেন ''সবার উপরে

মানুষ সত্য'' কিংবা ''অহিংসা পরম ধর্ম''—এই পরম সত্য কথাগুলি। দেখিয়ে গেছেন এই ত্রিতাপ দুঃখ কষ্ট রোগ শোক মোহ মায়া ভরা পৃথিবীর জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন কাটিয়ে ওঠার বিভিন্ন পথ।

আইনস্টাইনের দৃষ্টিতে ধর্ম

বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের এক প্রবন্ধের অংশ—''যদিও অনেকের মতে বিজ্ঞান এবং ধর্ম দুইটি বিপরীত মেরুর বিষয় তবুও এই দুই বিষয়বস্তুর মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক আছে। এটা ঠিক ধর্ম একটা লক্ষ্যের কথা বলে, কিন্তু কি উপায়ে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় তা শেখায় বিজ্ঞান। প্রকৃত বিজ্ঞান কেবলমাত্র তাঁরাই সাধনা করতে পারেন যাঁরা সত্যানুরাগী, সত্যের পূজারী। এই সত্যের প্রতি আসক্তি আসে ধর্ম থেকে। অতএব বলা যেতে পারে ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ, বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ''।

নিয়তি কি?

নিয়তি অর্থে নিয়ম, সৃষ্টির নিয়ম যা প্রাকৃতিক নিয়মকানুনের মধ্যে আছে ধরা। গুটিপোকা যেমন লালাতে আবদ্ধ আমরা জীবকুলও তেমনি নিয়মের বেড়াজালে বাঁধা ও বন্দী। নিয়তিকে খণ্ডন করার উপায় কারোও নেই—'নিয়তি কেন খণ্ডতে'। এই নিয়মের বাইরে গেলে ক্ষতিতে পড়ে যেতে হয় অর্থাৎ শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। অত্যধিক সুরা কি ধূমপান অথবা অসংযতভাবে জীবন যাপনে শরীর যেরূপ রোগাক্রান্ত হয়, তেমনি পিপীলিকা আগুনের কাছে আসলেই মারা পড়ে অবুঝ হলেও প্রাকৃতিক নিয়মকে অবহেলা করার কারণে। অর্থাৎ সৃষ্টির নিয়মের পরিপন্থী কাজে সাজা অবশ্যম্ভাবী। এই গর্হিত কর্মের গভীরতা তথা পরিসর অনুযায়ী এর সাজা, মানুষের ক্ষেত্রে যা এক জন্ম ছাড়িয়ে পরজন্ম পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হতে পারে।

নিয়মের রক্ষাকর্তা বা রক্ষকের নাম যম, যার কাছে আছে প্রতিটি নিয়ম ভঙ্গকারীর জন্য নিখুঁত বিচারে যথাযথ সাজার ব্যবস্থা, যেখানে গরীব-ধনী, রাজা-প্রজা, শ্রমিক-মালিক, ছাত্র-অধ্যক্ষ, শ্রমজীবী বুদ্ধিজীবী, পণ্ডিত-মূর্খ কিংবা সাধু-গৃহীর মধ্যে কোনও ভাগাভাগি বা বাছাবাছি নেই। প্রকৃত জ্ঞানীরা নিয়তির এ-সব বিধান জেনে নিয়ে আগে ভাগে কর্তব্য কর্মে সচেতন থাকেন আর মূঢ়রা বোধশক্তি হারিয়ে জন্ম-জন্মান্তরে দুঃখের সাগরে ডুবতে থাকেন।

যুধিষ্ঠিরকেও নরক দর্শন করতে হল — কিন্তু কেন?

সৃষ্টির নিয়ম চিরন্তন—সবার জন্য এক। সেখানে ছাত্র শিক্ষক, রোগী ভোগী, ফকির, বাদশা, সাধু চোর কারো ক্ষমা নেই। রাত বেরাতে বনে

জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালে সাপের ছোবলে মরতে হতে পারে, সেখানে যুবক যুবতী জ্ঞানী গুণীরও পরিত্রাণ পাবার উপায় নেই।

মানুষের বিচারে ভালো এবং মন্দে কাটাকাটি বা যোগ বিয়োগ থাকলেও ঈশ্বরীয় বিধানে এ জিনিস নেই, সেখানে পাপ-পুণ্যে কাটাকাটি হয় না। ভাল কাজের ফল ভাল—স্বর্গীয় সুখ এবং মন্দ কাজের ফল নরকে বাস অর্থাৎ জ্ঞানের আলোক থেকে বঞ্চিত হওয়া।

যুধিষ্ঠির জীবনভর কর্তব্যপরায়ণ, ধর্মনিষ্ঠ, নিঃস্বার্থপর, সুবিবেচক, সৎকর্মী, শাস্ত্রজ্ঞ — এরূপ মহৎ গুণের কারণে স্বর্গে যেতে পেরেছেন, কিন্তু ক্ষণিকের সত্যের ভিতর মিথ্যা কথা "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ"—বলার বা লুকিয়ে রাখার অপরাধে ঈশ্বরীয় নিয়মে নরক দর্শন করতেও বাধ্য হয়েছেন।

নিকৃষ্ট কি ও কে ?

যে জিনিস কারো কোনও কাজে লাগে না তাই নিকৃষ্ট নামে চিহ্নিত হয়ে থাকে। এই হিসাবে সৃষ্টিতে একটি জিনিসও পাওয়া যাবে না বা নেই যা কারো কাজে লাগে না। আমরা যে মল ত্যাগ করে থাকি তা অমাদের কাছে নিকৃষ্ট মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা নয় যেহেতু ওখানেও হাজার হাজার কৃমি কীট ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীদের বসবাস, ওদের বেঁচে থাকার সমূহ রসদ ওখানেই।

আমরা যখনি ব্যহ্যিক দৃষ্টিতে দেখি বা বিচার করে থাকি তখনি এরূপ ভুল হয়, কিন্তু অন্তর নিহিত দৃষ্টিতে এরূপ হয় না। তখনি বোধ হয় একজনের কাছে যা অতি সাধারণ বা মূল্যহীন অন্যজনের কাছে তা অতি প্রয়োজনীয় বা উৎকৃষ্ট।

কিন্তু না, তা হলেও নিকৃষ্ট আছে এবং তা আছে এই পৃথিবীতে আমাদের কাছে আমাদের মাঝেই। আমরা নিজ নিজ দেহকে 'আমিই সব' ধরে ফেলেছি কিন্তু এই দেহের যিনি পরিচালক ও নিয়ন্ত্রণ কর্তা সেই 'আমিত্ব'কে চিনতে পারছি না, কাজেই সৃষ্টিতে নিকৃষ্ট বলতে কেবলমাত্র একজনই আছেন যিনি সেই পরমপিতার রাজত্বে বসবাস করে তাঁরই অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না, তাঁর করুণার ছোঁয়াচ ও কৃপার স্পর্শকে কাজে লাগিয়ে নিকৃষ্টতার অন্ধকার কাটিয়ে উৎকৃষ্টতার আলোকে আসতে পারেন না।

নিদ্রা ও সমাধি—তফাৎ কি?

আমরা প্রত্যেকেই প্রতিদিন নিদ্রা যাই। নিদ্রা শরীরের এক বিশেষ অবস্থা। নিদ্রার দ্বারা আমাদের দেহের ক্লান্তি দূর হয়। এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। কিন্তু

সমাধি মানব শরীরের এক বিশেষ ব্যতিক্রম, ধ্যানের চরম অবস্থা যা সবার মধ্যে ঘটে না, হাজার হাজার কি লক্ষ লক্ষ জনগণের মধ্যে সামান্য মাত্র দু'একজনের ক্ষেত্রেই এমনটি ঘটতে দেখা যায়। এখানেও আছে ঐ একই প্রাকৃতিক নিয়ম, কাজে লাগানোর পদ্ধতি এবং কলা কৌশল হিসাবে কখনো নিদ্রা বা কখনো সমাধি। সমাধির দ্বারা আমাদের মনের একাগ্রতা বাড়ে, মন পবিত্র হয়, মনের বহুমুখী চিন্তা দূর হয়, মন নতুনত্বের স্বাদ পায়।

নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নে দেখা অবস্থা সমাধিস্থ অবস্থায় ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যে কূটস্থে দেখা ঘটনাসমূহ দুই একই রকম, হুবহু জাগরিত অবস্থায় চোখে দেখার ন্যায়, কারণ এখানে উভয়ক্ষেত্রেই কাজ করে মানবশরীরের মন নামক বস্তুটি, যার দিবারাত্র নিদ্রা নেই। অতন্দ্র প্রহরীর মতো যে সর্বদাই জাগরিত।

মজার কথা নিদ্রা অথবা সমাধি যে কোনও অবস্থায় দেহের দাঁড়ানো, বসা বা শোওয়া কোন বোধ থাকে না, বাহ্যজ্ঞান পুরোপুরি লোপ পেয়ে যায়। কিন্তু সমাধিস্থ অবস্থায় স্থির হয়ে বসে থাকা একজনের পক্ষে সম্ভব, যেটি নিদ্রিত অবস্থায় কোনও মতেই সম্ভব নয়।

প্রাণবায়ু

আমাদের দেহের ভেতরকার যে বায়ু তা প্রাণবায়ু নামে চিহ্নিত। এই বায়ু বা বাতাসই মানবদেহকে বাঁচিয়ে অর্থাৎ প্রাণ দিয়ে রেখেছে। এই বায়ু বিহনে আমাদের দেহ থাকলেও তা জড় রূপেই পরিগণিত হয়ে থাকে, ঘটে মৃত্যু। সৌরলোকে এই বায়ু নেই, সেই কারণে ওখানে মানুষ বাঁচতে পারে না। প্রকৃতির যে বায়ু তার ঘনত্ব অনেক বেশী, মানুষ নিতে সক্ষম নয়। কোন কোন সাধু মুনি ঋষি তা গ্রহণে সক্ষম হন ফলে দীর্ঘদিন আহারাদি ত্যাগ করে বেঁচে থাকতে পারেন। পৃথিবীর গাছপালা প্রকৃতির বায়ু Purified করে থাকে ফলে জীবকুল তা গ্রহণে বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়।

প্রাণবায়ুর ভিতর যে অক্সিজেন আছে তার রঙ সাদা, কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে বায়ুর রঙ কালো। মানবশরীরে এই জলকণা মিশ্রিত প্রাণবায়ু থাকার কারণে আমরা প্রকৃত সত্য জানতে বা ঈশ্বর সদৃশ জিনিসকে ধরতে পারছি না। এ সব সময়েই পথ আটকে রেখেছে। এই প্রাণবায়ুর গতি শরীরের উপর থেকে নীচের দিকে, ঐ গতির সাথে সমতা আনতে সাধন ভজনে বায়ুর গতি নিম্নে মূলাধার থেকে ঊর্ধ্বমুখী করতে হয়। কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত করার মধ্য দিয়ে যার কাজ শুরু। প্রাণবায়ু স্থির হলেই মন স্থির হয়, আর তখনি সাধন ভজনে ঈশ্বর সদৃশ জিনিসের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। এই

অবস্থার নাম ষট্ চক্রভেদ। এর আরো পরে অনেক দূরে সহস্রা, যেখানে গেলে সৃষ্টি রহস্য ভেদ হয়, সেখানে প্রাণবায়ুর কোনও স্থান নেই।

প্রাণায়াম কথাটির অর্থ কি?

প্রাণায়াম শব্দটি চলতি কথায় প্রাণের আরাম বা প্রাণারাম অর্থাৎ যে ব্যবস্থাপনার দ্বারা প্রাণকে নিজের খুশিমতো পরিচালনা করা যায়। প্রাণায়াম যৌগিক সাধন ভজনের প্রক্রিয়া বিশেষ। নির্দিষ্ট রীতিতে শ্বাসগ্রহণ (পূরক) শ্বাসধারণ (কুম্ভক) ও শ্বাসত্যাগ (রেচক)—এই প্রক্রিয়ার শাস্ত্রীয় নাম প্রাণায়াম। প্রাণায়ামের দ্বারা শরীরের প্রাণবায়ু অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস নিজের বশে আনা যায়। শ্বাসবায়ু আয়ত্তে আনতে পারলে শরীরকে অনেক রোগ থেকে মুক্ত অর্থাৎ নীরোগ করা যায়, এমনকি মৃত্যুকেও নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসা যায়। গরু যেমন দড়িতে বাঁধা, প্রাণীরাও তেমনি প্রাণেতে বাঁধা, প্রাণের উপর একদিকে সূক্ষ্ম মন অন্যদিকে স্থূল দেহের অস্তিত্ব ও কাজ কারবার তথা দহরম মহরম। যে কৌশল অবলম্বনে এই সূত্রটি ধরা বা বোঝা যায় তারই নাম প্রাণায়াম।

প্রাণায়াম এমন এক বিশেষ পদ্ধতি যা অবলম্বনে সৃষ্টির আদি, অনাদিরও আদিতে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব হয় এবং একমাত্র তখনি জানা সম্ভব হয় পরম অর্থাৎ প্রকৃত সত্যকে। তখনি লাভ হয় পরম জ্ঞান—মানবদেহে প্রাণের সাথে মনের সু-সম্পর্কের কথা।

প্রাণায়াম সিদ্ধ বলতে কি বোঝায়?

প্রাণায়াম সিদ্ধ অর্থে নিজের প্রাণ তথা প্রাণবায়ু আয়ত্ত করতে সিদ্ধ হস্ত হওয়া বা ক্ষমতা অর্জন করা। আমরা প্রাণবায়ু বিহনে মুহূর্তে মারা যাই, এক মুহূর্তও বাঁচতে পারি না। কিন্তু প্রাণায়াম সিদ্ধ মহাপুরুষগণ ঐ বায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রয়োজনে নিজের মৃত্যুর সময় এগিয়ে বা পিছিয়ে দিতে পারেন। মহাসাধক তৈলঙ্গ স্বামীর ক্ষেত্রে আমরা এরূপ জিনিস দেখতে পেয়েছি।

একমাত্র প্রাণায়াম অভ্যাসকারী পুরুষগণই বিশেষ বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হন। যক্ষরক্ষ, সুন্দরী নারী, অর্থকরি ধনদৌলত, মহামূল্য কাম্য সামগ্রী এদের করতলগত হতে থাকে। কিন্তু এখানে লোভে বা মায়ামোহে বশীভূত হয়ে গেলে বা মজে গেলে সমূহ বিপদ। দীর্ঘদিনের ত্যাগ তিতিক্ষা প্রচেষ্টা ও প্রস্তুতি মুহূর্তের মধ্যে সব শেষ। একমাত্র জন্ম-জন্মান্তরের সাধন ভজন ও সুকৃতির জোরে কামনা বাসনার উপকরণে ভরা ঐ মোহ মাখানো

অবস্থা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়। তখন প্রাণায়াম অভ্যাসকারী সাধক পরিগণিত হন বা হয়ে থাকেন প্রাণায়াম সিদ্ধ মহাপুরুষ রূপে। প্রাণায়ম সিদ্ধ মহাপুরুষগণ বিশেষ বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হন যা সাধারণ সাধকদের ক্ষমতার থেকে অনেক বেশী।

মূর্তি পূজা

মূর্তি হল মাধ্যম—ঈশ্বরকে জানার মাধ্যম, জানা হয়ে গেলে আর দরকার নেই। না শেখা পর্যন্ত বই, শেখা হয়ে গেলে আর দরকার কোথায়? দ্বিতীয় শ্রেণীতে আর বর্ণ পরিচয়ের দরকার আছে কি? জল স্থূল, এর দুটি সূক্ষ্ম উপাদান হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন। হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাদি জানার জন্য জলের মধ্য দিয়ে এগোন সহজ। মূর্তি হল সাকার অর্থাৎ স্থূল। এর মধ্য দিয়ে নিরাকার অর্থাৎ সূক্ষ্মতে পৌঁছে যাওয়া অনেক সহজ। সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই তিন দেবতার মধ্য দিয়ে মানবরূপ মূর্তির প্রথম প্রকাশ। জন্ম-বৃদ্ধি এবং মৃত্যুর খুঁটিনাটির বিবরণ আমরা এদের থেকেই প্রথম জানতে পেরেছি, এখান থেকেই শুরু হয়েছে মূর্তি পূজার।

ঈশ্বর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, অনন্ত শক্তিময় বিরাট তেজ সম্পন্ন এক জ্যোতি। এর কোনই আকার ও মূর্তি নেই। সেই কারণে ঈশ্বরকে পূজা করি, কিন্তু ঈশ্বর নামে কোনও বিশেষ বা নির্দিষ্ট মূর্তি স্থাপন করি না বা কোথাও দেখি না। আমাদের ভাবনা-চিন্তা করার সুবিধার্থে ঈশ্বরকে বিশেষ মানব মূর্তিরূপে মনের মাঝে কল্পনা করা হয়েছে মাত্র।

পূজা আচ্চার আদৌ প্রয়োজন আছে কি?

আমরা ফুল পাতা ফল-মূল ধূপ ধুনো দিয়ে ঠাকুর দেব-দেবীর পূজা দিই, তাদের নামে নৈবেদ্য সাজাই, ভোগ নিবেদন করি, গৃহস্থের কল্যাণ কামনায় যাগ-যজ্ঞ হোম প্রভৃতি কর্ম করে থাকি। কিন্তু ঠাকুর এসব কিছুই খান না বা গ্রহণ করেন না। সাধারণ ভাবেই প্রশ্ন জাগে এসবের আদৌ প্রয়োজন আছে কি-না?

পূজা-আচ্চা আর কিছুই নয়, গুণীজনের গুণের স্বীকৃতি। মানুষ যেখানে বা যার কাছে উপকার পেয়েছে, যারে স্মরণ মনন করে বিপদ আপদে উদ্ধার তথা বাঁচার পথ কিংবা বাধা বিঘ্ন সমূহ অতিক্রম করতে সক্ষম ও সমর্থ হয়েছে নিজের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে তারে স্থান দিয়েছে। নিজের প্রিয়জনকে

উপহার দেওয়ার ন্যায় পছন্দের সেরা বা মনের মতো জিনিসটি তারে উপহার দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে।

আমাদের সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার জন্য বহুমুখী কর্ম এবং তার ভাল-খারাপের দিকগুলি বিভিন্ন দেব-দেবীর থেকেই পাওয়া। এরাই জনসমক্ষে মানবের কর্তব্যকর্ম সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়েছেন। ভারতীয় আর্য ঋষিগণের কাছে সর্বপ্রথম এই জিনিসটি ধরা পড়ে। ফলে তারা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা পদ্ধতি এবং তার নিয়ম বিধি প্রবর্তন করেন—যা সমাজের বুকে বংশ পরম্পরায় আজও চলে এসেছে।

সৃষ্টির ঊষাকাল থেকে এরূপ এক অপ্রামাণ্য জিনিস যুগ যুগ ধরে মানব সমাজে প্রচলিত রয়েছে বিশ্বের সর্বত্রই। মানুষের মন থেকে মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। এর পিছনে কি রহস্য লুকিয়ে আছে তা বিজ্ঞানের উদঘাটন করার দরকার।

তবে আমরা ঈশ্বর দেব-দেবী মানি অথবা না মানি আর পাঁচটি অনুষ্ঠানের ন্যায় পূজা আচ্ছার নিশ্চয়ই দরকার আছে। মানব জীবনে এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এর পিছনে থাকা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ কারণগুলি হল —

* আমাদের অতীত বর্তমান যে একই আছে এরূপ অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে আমরা তা জানতে পারি, পূজা করে আমরা যদি ভেঙে যেতাম তাহলে তা করতাম না।

* পূজা হচ্ছে যোগ্যতার এক স্বীকৃতির অনুষ্ঠান। মানুষকে অনুপ্রেরণা দেওয়া—তুমি যোগ্য হও, তোমারও কথা পৃথিবীর বুকে অক্ষয় অমর হয়ে থাকবে, বিশ্বের লোক তোমার জয়গান গাইবে, তোমায় পূজা করবে।

* ধর্মের নামে গোঁড়ামি, অন্ধত্ব, কুসংস্কার সমূহ কাটিয়ে আসল ঐশ্বরিক সত্ত্বার মহিমা তুলে ধরার সুযোগ ঘটে।

* ঘরদোর নতুন করে সাজানো গোছানো রঙ করা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতায় নিজের তথা পরিবেশের উন্নতি ঘটে।

* উৎকৃষ্ট ফলমূল সমন্বিত খাদ্যাদি গ্রহণে শারীরিক ক্ষমতা বাড়তে সাহায্য করে।

* ব্রত উপবাস নিরামিষ আহারে শারীরিক উন্নতি ঘটে।

* পাঁচজন জ্ঞানী গুণীদের আগমনে পরিবেশের উপর উন্নততর চিন্তাভাবনা ও কাজকর্মের ছাপ পড়ে।

* নতুন অথবা অপরিচিতদের আপন করে গ্রহণ করার সুযোগ ঘটে।

* পারস্পরিক মত বিনিময় ও ভাব আদান প্রাদানের ক্ষেত্র তৈরি হয়, সামাজিক মিলন বন্ধন ঘটে।

* সবাই ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার সুবাদে বহুদিনের পুরানো ঝগড়াঝাঁটি ও পারস্পরিক বাদ বিসম্বাদ ও সমস্যা সমাধানে সহজ হয়।

* এক শ্রেণী বিশেষতঃ সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর আয়ের পথ খুলে যায়, জীবন ও জীবিকার পথ প্রসারিত হয়।

আমরা স্বীকার করি অথবা না করি পূজা আচ্ছার সব থেকে বেশী দরকার ভক্তি মার্গে, ভক্তির দ্বারা ভগবানের দর্শন লাভে, আর দরকার সমাজে যারা মনের দিক দিয়ে দুর্বল বিশেষতঃ তাদের জন্য। পূজা হোম যাগ যজ্ঞ নাম সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে এদের মনের বল বাড়ে, একাগ্রতা তৈরি হয়, মনে ভরসা আসে, মন পবিত্র হয়, পারস্পরিক প্রেম প্রীতি ভালবাসার উদ্রেক হয়।

কিন্তু সমস্ত কিছু বোঝাপড়া হয়ে গেলে অর্থাৎ একমাত্র সৃষ্টির রহস্য ভেদেই বলা সম্ভব হয় মানব জীবনে দেব-দেবী পূজা পার্বণের আদৌ প্রয়োজন আছে কি-না? যদি থাকে তা কোথায়, কীভাবে এবং কতখানি আছে। তখনি বলা সম্ভব হয় পূজা অর্চনা উপাসনা উপবাস বার ব্রতের নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে, তবে ঈশ্বরের দেখা না মেলা পর্যন্ত। ঈশ্বর দর্শন ঘটে গেলে এসবের আর প্রয়োজন নেই। বাক্য গঠন করতে শিখে গেলে তখন আর শব্দ গঠনের প্রয়োজন থাকে না, ফুরিয়ে যায়। তখন কেবল ভাবনা বাক্যের ভাবার্থ এবং মমার্থ নিয়ে। অনুরূপভাবে ঈশ্বরের দর্শন মিলে গেলে পূজা উপাচারের আর দরকার নেই, এখন কেবল দরকার মূল নিরাকারকে পাবার জন্য সাধন ভজন পদ্ধতির সুনির্দিষ্ট পথ ধরে কেবল এগোতে থাকা।

পাপ-পূন্য তফাৎ কোথায়?

সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের পরিপন্থী যে কোনও কাজ করা পাপ, সৃষ্টির নিয়মকে মান্য করে চলাই পুণ্য। পাপ অর্থে জং ধরে যাওয়া, পুণ্য অর্থে স্বচ্ছ থাকা। সুতরাং পাপের ফল ক্ষতিতে পড়ে যাওয়া আর পুণ্য কাজের ফল ক্ষতি থেকে রেহাই পাওয়া।

আমাদের মানুষের সাধারণ বিচারে সেই ব্যক্তি তত বেশী পুণ্যবান যিনি যত বেশী অর্থকড়ি কি প্রভূত সুখ সম্পদের অধিকারী। মানুষের বিচারে পাপ-পুণ্যের ফলাফল এভাবে নির্ণয় হয়ে থাকলেও ঈশ্বরীয় বিধানে এভাবে

হয় না, সেখানে পাপ অথবা পুণ্যের ফলাফল মানসিক সুখ শান্তি অথবা মানসিক দুঃখ কষ্টের বিচারে নির্ধারিত হয়। যে কোনও গঠনমূলক কাজ অর্থাৎ ভাল কাজ তথা পুণ্যের ফল মানসিক প্রশান্তি বা স্বর্গীয় সুখ আর খারাপ কাজ তথা পাপের ফসল মানসিক অশান্তি তথা নরক বাস।

এখানে আর একটি কথা বলে রাখতে হয়, যা হল মানুষের কাছে লাভ-ক্ষতির বিচারে যোগ বিয়োগে কাটাকাটি থাকলেও ঈশ্বরীয় বিধানে এমনটি নেই। সেখানে পাপ বা পুণ্যের ফলে যোগ বা বিয়োগ হয় না, উভয় ক্ষেত্রেই ফলাফল পৃথক পৃথক বা আলাদা আলাদা হয়ে থাকে যা ভোগ করতেই হয়। সত্যবাদী যুধিষ্ঠির ক্ষণিকের মিথ্যা কথা বলার অপরাধে স্বর্গে যাবার আগে নরক দর্শন করতে বাধ্য হয়েছেন—এর এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

পরমাত্মা

সাধারণ ভাবে জীব অর্থে জীবাত্মার পরম অবস্থা পরমাত্মা নামে চিহ্নিত। পরমাত্মা, পরম ব্রহ্ম, পরমেশ্বর পরম সত্বা মূলতঃ একই—একম্ অদ্বিতীয়ম্, নির্গুণ নিরাকার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। পরমাত্মা হচ্ছেন বিশেষ গুণ ও ক্ষমতা, মানুষ তার হাতের পুতুল মাত্র। কোন ব্যক্তি তার কর্ম, শিক্ষা-দীক্ষা, ক্ষমতা, প্রভাব প্রতিপত্তি, যশ-মান-খ্যাতি কি সুনামের জোরে নিজ জন্মদাতা পিতাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে কিন্তু কোনও জীব বিশেষতঃ মানুষ তার জন্ম তথা সৃষ্টির মূলে থাকা ঈশ্বরকে কোনও দিন দখলে আনতে পারবে না, করতলগত হয়ে থাকতেই হবে।

জল স্থল স্থাবর জঙ্গম ঊর্ধ্ব অধঃ সমস্ত সৌরজগৎ এমনকি দেবকুলসহ সমস্ত কিছু সৃষ্টির মূলে থাকা এই অনাদিরও আদিকে যুক্তি তর্ক ও বুদ্ধির বিচারে ব্যক্ত বা ব্যাখ্যা করা যায় না। লাখ লাখ কি কোটি কোটি সাধু মুনি ঋষি সন্ন্যাসীদের মধ্যে সামান্য মাত্র হাতের আঙুলে গোনা কয়েকজন এর স্বরূপ জানতে বা জানাতে সক্ষম হয়েছেন। বিজ্ঞান এর ধারে কাছে এখনো পৌঁছাতে পারেনি। একমাত্র যৌগিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ায় পরমেশ্বর পরমসত্বাকে জানা সম্ভব, এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনও পথ নেই। যৌগিক ক্রিয়া কৌশলাদির দ্বারা ষট্‌চক্রভেদের পর ঐ ঐশ্বরিক সত্বার প্রকৃত স্বরূপ বোধে আনতে সাধককে মানবদেহের সবার উপরে থাকা টিকির স্থান সহস্রা বা ব্রহ্মরন্ধ্রে পৌঁছাতে হয়। একজন সাধকের ঐ স্থানে পৌঁছাতে জীবনের সুদীর্ঘ সময় লেগে যায়। তখনি জানা যায় পরমাত্মা, পরম শক্তির আধার বিশেষ—ব্যতিক্রম এক উজ্জ্বল আলোক দ্যুতি, যা সাধন ভজনে মানবদেহের ভ্রূদ্বয়

মধ্যে কূটস্থে লোহিত বর্ণ রূপে এবং পরবর্তীকালে মৃদু মন্দ বাতাসে ঢেউ খাওয়া স্বচ্ছ জলে প্রতিফলিত স্পষ্ট জ্যোৎস্নার মত শ্বেত শুভ্ররূপে স্থায়ীভাবে প্রতিফলিত হয়। ওখানে টিভির পর্দায় ছবি ফুটে ওঠার ন্যায় বিভিন্ন ঘটনা ফুটে ওঠে, সাধককে তা থেকে ধরে নিতে হয়।

পরমাত্মা থেকে পরমা প্রকৃতি তথা বিশ্বপ্রকৃতি। সূর্য গ্রহ নক্ষত্রাদি সৃষ্টির মূলে আছে এই সূক্ষ্ম প্রকৃতি, রঙ কালো। এর মধ্যে আছে ঠাণ্ডা তাপ যা কেরোসিন, ডিজেল বা পেট্রোলের আলোর সাথে তুলনীয়। এখানকার কর্ত্রী মাতৃস্বরূপা বৃহস্পতি। বৃহস্পতির কৃপা ছাড়া কোন জীবের পক্ষে জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন ঘটানো সম্ভব নয়। একমাত্র তখনি জানা যায় পরমাত্মার স্বরূপ তথা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাদি।

জীব, জীবাত্মা, পরমাত্মা মূলতঃ একই। জীব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, পরমাত্মা অসীম অনন্ত। এর কুল কিনারা পাওয়া জীবের সমস্ত রকম হিসেব নিকেশের বাইরে। আরো জানা যায় প্রাণ স্থির হলে মন, মন স্থির হলে আত্মা, আত্মা স্থির হলে পরমাত্মা—সবার মূলে প্রাণবায়ু। এই প্রাণবায়ু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল থেকে পাওয়া, যা ব্যূহ তৈরি করে রেখেছে, জীবকে ঐ পরমাত্মার সমীপে কোনভাবেই পৌঁছাতে দিচ্ছে না।

মানবজীবনের শ্রেষ্ঠতম জানা ঐ পরমাত্মা তথা পরমেশ্বরকে জানা। ঐ সত্ত্বাকে জানতে পারলে মানবজীবনের দুঃখ কষ্ট ভাল মন্দ পূর্বজন্ম পরজন্ম কর্মফল প্রভৃতি সমস্ত কিছুর সঠিক কারণ জানা হয়ে যায়। দূর হয়ে যায় সমস্ত রকম হিংসা বিদ্বেষ জাত পাত পাণ্ডিত্যের বড়াই গর্ব ও অহংকার, লোপ পায় কামনা বাসনা মোহ মাৎসর্য মায়া মমতা মাদকতা সমস্ত কিছু। বিলুপ্ত হয় মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দ্বন্দ্ব এবং সমস্ত রকম ভুল বোঝাবোঝি। সম্ভব হয় জন্ম মৃত্যুর বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসা।

কাঁচা লোহা যেমন চুম্বকের সংস্পর্শে নিজেই চুম্বক হয়ে যায়, জীবও তেমনি পরমাত্মার সংস্পর্শে এসে নিজেই শিব হয়ে যায়। এখনই বোধ হয় 'সোহম্' অর্থাৎ সে বা তিনি যা আমি নিজেও তাই—আমিই ব্রহ্ম।

জীবনের শৈশবকাল থেকে শরীর তৈরি না করে কেবলমাত্র কৌতূহল বশে বা লোকের কথা শুনে অথবা পত্র-পত্রিকা কি পুস্তকাদি পড়ে এ পথে হাঁটা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। শারীরিক ক্ষতির প্রভূত সম্ভাবনা, মৃত্যুও ঘটে যেতে পারে।

প্রকৃতি

প্রকৃতি অর্থে প্রকৃত সত্য, যার পিছনে সঠিক তথ্য লুকিয়ে আছে, যার দ্বারা প্রকাশ ঘটে থাকে। প্রকৃতি অর্থে যা চেতনা জাগায়।

প্রকৃতির নিজস্ব নিয়ম আছে, যে নিয়মে অদ্যাবধি সমস্ত জীবকুল বাঁধা। এই নিয়ম ভাঙলেই বা নিয়মের বাইরে গেলে সাজা অবশ্যম্ভাবী। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বেই—শিশু বালক বৃদ্ধ বৃদ্ধা জ্ঞানী পণ্ডিত চোর ডাকাত সাধু ঋষি কারো ক্ষমা নেই।

প্রকৃতির দুটি রূপ বা দুটি ভাগ প্রথমটি হল সূক্ষ্ম প্রকৃতি সমস্ত সৌরজগৎ এখান থেকে সৃষ্ট, এর অধীন ও করতল গত। সূক্ষ্ম প্রকৃতি বাতাস বিহীন।

দ্বিতীয়টি হল স্থূল প্রকৃতি আমাদের উন্নতি অবনতি সমস্ত কিছু কাজ কারবার এই স্থূল প্রকৃতিতে। এর দ্বারা জীবকুলের জীবনযাত্রা নির্বাহ হয়ে থাকে। এর থেকে উপরে উঠতে পারলে বা মায়া কাটাতে পারলে ঘটে যায় মুক্তি। স্থূল প্রকৃতি বাতাসে ভরা। এই প্রকৃতির এমন এক বিশেষ ক্ষমতা যে পৃথিবীর বুকে যখন যে জিনিসটির প্রয়োজন তা নিজেই পূরণ করার বন্দোবস্ত করে দেন। স্থূল এবং সূক্ষ্ম এই উভয় প্রকৃতি সৃষ্টির সমতার সূত্রের উপর ভিত দিয়ে তৈরি। আমাদের দরকার ঐ বিভিন্নতার মধ্যে সমতা আনতে ঐ good System follow up করে চলা।

আমাদের এ তথ্যটি জানার বিশেষভাবে দরকার, যা হল যে কোনও গঠনমূলক কাজে আমাদের উন্নতি অবধারিত, যেখানে প্রকৃতি প্রতি পদে পদে আমাদের Guide করে থাকেন, ভুল পথে চললে ধাক্কা দিয়ে শোধরেও দেন কিন্তু সৃষ্টিয় নিয়মের বিরুদ্ধ চিন্তায় বা প্রাকৃতিক নিয়মের পরিপন্থী কাজে কাউকে ক্ষমা করেন না, উপযুক্ত সাজার ব্যবস্থা করেন। কৃতকর্মের গভীরতা অনুযায়ী এই সাজার পরিমাণ এ জন্ম ছাড়িয়ে নিজের পরজন্ম পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে।

বিজ্ঞান এই দুই প্রকৃতিকেই ধরতে সমর্থ। স্থূল প্রকৃতির মধ্য দিয়ে সে সূক্ষ্ম প্রকৃতিতে পৌঁছে গেছে। কিন্তু এই দুইয়ের মূলে যে, সেই সে পৌরুষকার শক্তি তথাকথিত ঈশ্বর, সেখানে সে এখানো পৌঁছাতে পারেনি।

পৃথিবী কার প্রয়োজনে?

কারণ নিয়েই কার্য, কারণ ছাড়া কোনও কার্য সাধিত হয় না। সৃষ্টির প্রতিটি কাজে আছে কোন না কোনও কারণ যা অনেক সময় আমাদের কাছে

ধরা পড়ে, অনেক সময় পড়ে না। ফলে, অনেক সময় আমরা ভুল করে থাকি, আমরা হতাশায় ভুগি অথবা ক্ষতিতে পড়ে যাই।

বিশ্বচরাচরে প্রতিটি ক্ষেত্রে আগের জন বা আগের জিনিসের জন্ম হয়েছে পরের জন বা পরের জিনিসের জন্য। আগে জল, পরে জলচর প্রাণী, আগে অন্ধকার, অন্ধকার কাটানোর জন্য পরে আলো। অনুরূপভাবে আগে পৃথিবী, তার বুকে গাছাপালা ফুল ফল জল নদী, পরে জীবকুল যার সর্ব কনিষ্ঠ জীব আমরা মানুষ। সুতরাং আমাদের মানুষের প্রয়োজনেই এই পৃথিবীর সৃষ্টি।

পৃথিবীর ওজন

অতি সম্প্রতি ইং ২৩/৯/০৭ আনন্দবাজার পত্রিকা (যৎকিঞ্চিৎ) থেকে আমরা যে খবরটুকু পেয়েছি তা হল —"সাড়ে আটশো কৃত্রিম উপগ্রহ বন্ বন্ করছে মহাকাশে, আর তাদের রুটে হু-হু করে উড়ে বেড়াচ্ছে ৩.৫ কোটি জঞ্জালের টুকরো (মহাকাশ যানের ভাঙা চোরা অংশ);" এ থেকে আমাদের সকলেরই মনে হতে পারে সৃষ্টির আদিতে বা শুরুতে পৃথিবীর ওজন যা ছিল তা অতি সামান্য করে হলেও দিনে দিনে কমে যাচ্ছে, কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়, ভুল।

পৃথিবীর ওজন আদি থেকে আজ পর্যন্ত এক আছে এবং থেকেও যাবে, যা কোনও দিন কমবে না বা বাড়বেও না। এ জিনিস সৃষ্টির নিয়মেতে ধরা, নতুবা সমস্ত কিছু নিমেষের মধ্যে ওলটপালট হয়ে যাবে। সূক্ষ্ম প্রকৃতির এমনি এক ক্ষমতা যেখানে মহাশূন্যে মহাকাশযান বা অপর কিছু থেকে গেলেও সম ওজনের জিনিস কোন না কোনওভাবে পৃথিবীর বুকে পৌঁছে যাবে।

ব্যতিক্রম বন্ধু

আমরা মানুষ, সমাজবদ্ধ জীব। আমাদের পক্ষে একাকী থাকা সম্ভব নয়। শৈশবকাল থেকে শুরু করে আমৃত্যু বহুমুখী প্রয়োজনে আমরা ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গী তথা বন্ধুর প্রয়োজন অনুভব করে থাকি। যাদেরকে আমরা সব সময়ে বিশেষ করে দুঃসময়ে অথবা চরম বিপদে আপদে কাছে পাই তাদেরকে আমরা সাধারণভাবে বন্ধু হিসেবে ধরে নিই তাদের সাথে সখ্যতা জন্মে বেশী করে। যার থেকে আমরা কোনো উপকার পাই না অথচ বন্ধু থেকেছেন এ দৃষ্টান্ত নজিরবিহীন। আমাদের বন্ধুর প্রয়োজন অনুভূত হয় সব থেকে বেশি করে বৃদ্ধ বয়সে বা বার্ধক্যকালে, যখন আমাদের এক এক করে সমস্ত কিছু সহায় সম্বল কমতে থাকে বা হারিয়ে যায়।

আমরা প্রতিটি পুরুষ বা নারী প্রকৃত বন্ধু তারেই ভাবি বা বলে থাকি যার দ্বারা আমাদের স্বার্থ সিদ্ধি হয়। কিন্তু গভীরভাবে খতিয়ে দেখে বলা যায় আমাদের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রত্যেকের সত্যিকারের বন্ধু বা সঙ্গী আছেন একজনই। তা হল আমাদের নিজ নিজ 'কর্ম'। আমাদের শিশু বৃদ্ধ বৃদ্ধা দেশ বিদেশের রোগী ভোগী যোগী রাজা প্রজা উজির ফকির বাদশা সবাইকার চরম বিপদের দিনে এ কাউকে ছেড়ে যায় না, এমনকি মৃত্যুর পরেও না।

'কর্ম' নামক আমাদের এই নিত্যদিনের সঙ্গীটির সবার সাথেই সমান সখ্যতা। সেখানে আপন পর তুমি আমি সে তাহারা ভেদাভেদ করেনি, কাজি হাজি সাধু জ্ঞানী পণ্ডিত মূর্খ ছাত্র শিক্ষক গুরু শিষ্য ডাক্তার মোক্তার এমনকি চোর ডাকাত খুনি দুবৃর্ত্ত বদমেজাজি সবাইকে, যে তাকে যেমনভাবে গ্রহণ করেছে বা কাজে লাগিয়েছে তাকে সেইভাবে ফল পাইয়ে দিয়েছে, ধনী দরিদ্র ছোট বড় কাউকে হেরফের বা ইতর বিশেষ করেনি। আমাদের বিজ্ঞান মৃত্যুর পরের কোনোও সঙ্গীকে এখনো চিহ্নিত করতে পারেনি। কিন্তু আমাদের ধর্ম ব্যতিক্রম, 'কর্ম' নামক এই বন্ধুটিকে বেছে দিতে পেরেছে।

স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সমস্ত রকম যোগসূত্রের মূলে আছে ঐ একটিমাত্র কর্ম নামক অকৃত্রিম বন্ধুটি। সৃষ্টিকর্তাও কর্মের মধ্য দিয়েই তার সমস্ত শক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছেন, নিরাকার থেকে এসেছেন সাকারে। আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন তাকে পাবার জন্য আমাদের সাধারণ জনগণের ধর্মে মেতে থাকার দরকার নেই বা না থাকলেও চলে যাবে, কিন্তু প্রকৃত কর্মের ব্রতী না হলে তার সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব নয়, আমাদের জীবনযাত্রাও বানচাল হয়ে যাবে। আজকের আমাদের ভোগান্তির সব থেকে বড় এক কারণ এই কর্ম থেকে বিচ্যুত হওয়া, আমাদের সুখ দুঃখের চিরসাথী 'কর্ম' নামক এই আদি এবং অকৃত্রিম বন্ধুটিকে না চেনা।

'কেবল ঈশ্বর আর বিশ্বপতি যিনি, সকল সময়ের বন্ধু সকলের তিনি'— আমরা যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী তারা ঈশ্বর নামক এই অন্তরঙ্গ বন্ধুটিকে চিনেছি কিন্তু আস্তিক অথবা নাস্তিক সবাইকার সব সময়ের সঙ্গী এই ব্যতিক্রম 'কর্ম' নামক বন্ধুটিকে এখনো চিনলাম না। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের কাছে এর থেকে বড় আশ্চর্যের আর কিছু আছে বা হতে পারে কি?

বড় কে — ব্যক্তি না যুক্তি?

যুক্তিই বড়, ব্যক্তি নয়, যিনি যত বেশী যুক্তিকে ধারণ করে বক্তব্য রাখেন সবাই সেই যুক্তিবাদীকে তত বেশী মর্যাদা দিয়ে থাকেন।

ব্যক্তি অস্থায়ী, কিন্তু যুক্তি স্থায়ী, ব্যক্তির মৃত্যু আছে, কিন্তু যুক্তির মৃত্যু নেই। সেই কারণে সৃষ্টির উষাকাল থেকে যুক্তি স্ব-মহিমায় আজও বিরাজিত, চির উজ্জ্বল।

যুক্তি এমনি এক চির শাশ্বত ও সুন্দর জিনিস সেখানে যারা ঈশ্বর বা ঐশ্বরিক শক্তিতে বিশ্বাস করেন না, সেই নাস্তিকের দলও যুক্তিতে বশীভূত হয়ে পড়েন।

আমাদের একথা বিশেষভাবে জানার দরকার, ঈশ্বর বা ঐশ্বরিক শক্তির মহিমা দুই-ই যুক্তির উপর ভিত দিয়ে তৈরি, অন্ধবিশ্বাসের উপর গ্রথিত মোটেই তা নয়। সেখানে বলা হয়েছে প্রকৃতিতে মানুষ প্রথম যে জিনিসটি চোখে দেখেছে এবং আজও যা আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করে চলেছে তার সমস্ত রকম উপকরণ তথা রসদ ঐ প্রকৃতি থেকেই নেওয়া, যার মূলে অন্য কোন ব্যক্তি, বস্তু বা শক্তি—কিন্তু কোনও মানুষ নয়।

বাক্ সংযম

বাক্ সংযম বা কম কথা এবং সংযতভাবে কথা বলাতে লাভ অবশ্যই হয়ে থাকে। কম কথা বলাতে একদিকে যেমন গাম্ভীর্য বাড়ে, ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে, অন্যদিকে তেমনি শরীর থেকে তুলনামূলক ভাবে কম শ্বাসবায়ু বাহির হয়, ফলে মনের অস্থিরতা কমে, শরীর নীরোগ হয়, পরমায়ুও বেড়ে যায়। বাক্ সংযমের ফলে আমাদের মনে ধরে রাখার ক্ষমতাও বেড়ে যায়।

বাক্ সংযম অর্থে সম্পূর্ণরূপে কথা বলা বন্ধ করে দেওয়া মোটেই তা নয়, পরন্তু অপ্রয়োজনীয় কথা বলা বন্ধ করা।

বাক্ সংযমে অভ্যস্ত হওয়া সর্বক্ষেত্রে বিশেষতঃ সাধন ভজনের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

ব্রহ্মচর্য

ব্রহ্মচর্যের উদ্দেশ্য নিজের অন্তরকে তৈরি করা, চরিত্রে সততা আনা, ঈশ্বরকে পাবার জন্য প্রস্তুতি।

ব্রহ্মচর্য পালন অর্থে পবিত্রভাবে জীবন যাপন, সত্য কথা বলা, সৎ লোকের সাথে মেলামেশা, পর হিংসা ত্যাগ, গুরুমুখী ব্যবহার ইত্যাদি বুঝায়। শিক্ষা যেরূপ সবার জন্য, তেমনি ব্রহ্মচর্যও সবার জন্য দরকার। গৃহীরাও এরূপ জীবন যাপনে সহজেই অভ্যস্ত হতে পারেন।

আসল ব্রহ্মচর্য কতগুলো ক্রিয়া পদ্ধতি বা আচরণবিধি যেমন সাদা পোশাক পরিধান, ত্রি-সন্ধ্যা কোমর পর্যন্ত জলে ডুবানো—এর পর আহ্নিক, জপ,

ধ্যান, বেদ, গীতা পুরাণাদি পাঠ, শাস্ত্রানুশীল প্রভৃতিকে বুঝায়, এরূপ আচরণ আশ্রমবাসীগণের পক্ষেই পালন করা সহজ।

দেহ থাকলে যেমন প্রস্রাব পায়খানা থাকবে না এ হতে পারে না, তেমনি দেহ থাকবে অথচ কাঠামোগত গুণসমূহ থাকবে না এও হতে পারে না। মানব শরীরের দেহকাঠামোগত গুণ সমূহ থাকবেই। কাজেই দেহের কামনা বাসনা ভোগ লোভ লালসা যখন তখন ক্ষণে ক্ষণে আসবেই, এসব ভোগ করে ত্যাগ করা ব্রহ্মচর্য পালনের পথে সহায়ক। ব্রহ্মচর্য পালন অর্থে শুক্র ধারণ এরূপ এক বদ্ধ ধারণা সাবার আছে, কিন্তু মূলতঃ তা নয়, তা হলে জন্ম নিয়ন্ত্রণের পথে পা বাড়িয়ে সবাই ব্রহ্মচারী হয়ে যেতেন। কশ্যপ ও পরাশর মুনিদেরও সন্তান সন্ততি ছিল, বুদ্ধদেবও সন্তানের পিতা ছিলেন, আসলে যখন যেরূপটির দরকার। কাজেই ব্রহ্মচারীদের আচরণে সব কিছুই থাকতে পারে তবে খুবই সাবধান ও সতর্ক হয়ে, সমস্ত কাজেই থাকবে মার্জিত ভাব, নিয়মশৃঙ্খলা ও সংযত আচরণ। সবার উপরে থাকবে প্রতি পদে পদে পরিপূর্ণ হিসেব নিকেশের মধ্য দিয়ে কৃচ্ছ সাধনে জীবনযাপন এবং যখন যেরূপটির দরকার অনুরূপ আচরণের মধ্য দিয়ে চলা। সৎপথে ও সৎ ভাবনায় এসব জিনিস আপনাআপনি হয়ে যায়।

বায়ুশূন্য অবস্থায় কোনও মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব কিনা?

এর উত্তর না, সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য অবস্থায় কোনও মানুষের পক্ষে দিনের পর দিন স্থায়ীভাবে বেঁচে থাকা কোনও ভাবে সম্ভব নয়।

যৌগিক ক্রিয়া প্রণালীতে প্রাণায়াম অনুশীলনে একজন সাধকের পক্ষে এক নাগাড়ে কয়েক ঘন্টা বা বেশ কয়েক দিন বায়ু নিয়ন্ত্রণ করে বেঁচে থাকা সম্ভব, কিন্তু ষট্‌চক্র ভেদের পর সৃষ্টিতত্ত্ব জানার জন্য যে ২৭ বছর সময় লাগে ঐ সুদীর্ঘ সময়কাল অথবা তার পরবর্তী সময় সম্পূর্ণ শ্বাস প্রশ্বাস বিলীন হয়ে থাকা বা বাতাস ব্যতিরেকে বেঁচে থাকা কোনও সাধকের পক্ষে সম্ভব হয় না। এ সম্ভব হলে সৃষ্টিতত্ত্বই মিথ্যা হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে একজন কর্মযোগী ঐ সময় যে প্রাণবায়ু গ্রহণ করে থাকেন তা খুবই সামান্য যা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। একজন সম্পূর্ণ সুস্থ পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির শরীরে যতখানি বায়ুর প্রয়োজন থাকে তার থেকে পরিমাণে অনেক অনেক কম—একজন সদ্যজাত শিশুর বাতাস থেকে অক্সিজেন নেওয়ার থেকেও অনেক কম। একজন সাধকের নাকের ডগার সামনে দিনরাতের যে কোনও সময় হাতের আঙুল, কাগজ অথবা তুলার দ্বারা পরীক্ষা করলে এর সত্যাসত্য যাচাই হয়ে

যায়। এ জিনিস আরো বেশী করে ধরা পড়ে একজন যোগীর ছুটাছুটি কি ক্ষিপ্রগতিতে হাঁটা চলার পর, যেখানে শ্বাসের গতি কোনওরকম বৃদ্ধি পায় না, আগাগোড়া একই থেকে যায়।

ব্রহ্মজ্ঞ

ব্রহ্ম সম্বন্ধে যিনি জ্ঞাত আছেন বা সম্যক অবগত তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ নামে অভিহিত হয়ে থাকেন। একজন প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষেই সৃষ্টির গূঢ় রহস্য ব্যক্ত করা সম্ভব। স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল এই তিন ভুবনের সম্বন্ধে সম্যক ধারণা বা সমস্ত কিছুর সঠিক বর্ণনা এখানে এই পৃথিবীর মাটিতে থেকে বলে দেওয়া ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষে সম্ভব হয়। এর জন্য অন্য কোথাও বা গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যেতে হয় না, এখানে পৌঁছাতে পারলেই প্রাণীকুলের ভুল বা ত্রুটি সমূহ অতি সহজেই ধরা পড়ে। কিন্তু ব্রহ্মের অসীম শক্তি অনন্ত মহিমা ক্ষুদ্র মানুষের কারো একার পক্ষে এর সমস্ত কিছুর পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা কি ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব, এই কারণে ব্রহ্ম কোনও দিন উচ্ছিষ্ট হয় না—এই ভাবেই সাধু ঋষি যোগীগণ এর ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন।

একমাত্র সাধন ভজনে যৌগিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া অবলম্বনে ৭+৭ মোট ১৪টি স্তরে মানব শরীরের টিকির স্থান সহস্রায় পৌঁছাতে পারলে ব্রহ্ম সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়, নতুবা নয়। ব্রহ্মলোক বায়ুশূন্য, এখানে প্রাণের প্রবেশ একেবারেই নিষেধ, সমস্ত কিছুই মন নিয়ে কাজ কারবার, তাই অপর নাম মনোজগৎ অর্থাৎ মনের রাজ্য। এই মনোজগৎ জ্ঞানের রাজ্য—এই-ই হল স্বর্গ।

এরও আগে আছে সাধনভজনের ৬টি স্তরে ষট্ চক্রভেদ। এখান পর্যন্ত মানবদেহে বায়ুকে নিয়ে কাজ কারবার হলেও দেহকে বায়ুশূন্য করার খুব বেশী প্রয়োজন পড়ে না। বিভিন্ন পথে ও মতে এখান পর্যন্ত উপনীত হওয়া যায়। এখানেই ক্ষণিক সমাধি, মাঝে মধ্যে ঈশ্বর দর্শন, এর বেশী কিছু হবে না।

সপ্তম স্তর থেকে বায়ুকে ক্রমে ক্রমে পরিপূর্ণ Control এ আনতে হয়, শুরু হয় প্রাণকে মেরে মনের সাধনা। ঈশ্বর তত্ত্ব জানার জন্য নিজের Magnetic Power বাড়িয়ে নেওয়ার কাজ শুরু করতে হয় এখান থেকে। নিজে প্রকৃতির চুম্বক না হতে পারলে সৃষ্টির গোপন রহস্য ধরা যাবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রাণ রাখাই দায় হয়ে ওঠে। জীবন্ত মানুষকে জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দেবার পরের অবস্থা। সূক্ষ্মদেহে গুরুর পুনরায় দীক্ষা দান, মাতৃজ্ঞানে নিজ স্ত্রীর

স্তনদুগ্ধ পান এবং সর্ব্বোপরি মা মহামায়া রূপে ঈশ্বরের অহৈতুকী কৃপা ছাড়া শরীরের ঐ সময়কালীন মৃত্যু রূপ অসম্ভব জ্বালা থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। সাধন ভজনের শেষের এই ৭টি স্তরে যৌগিক ক্রিয়া প্রণালী অবলম্বনে এগোন ছাড়া সৃষ্টি রহস্য ভেদ করার দ্বিতীয় কোনই রাস্তা নেই। মনে রাখার দরকার আমাদের ঈশ্বর এক, তার সাথে বোঝাপড়ার পথও এক, বহু পথ নেই।

আমরা জানি তাপ পেলে বরফ আর জমাট বাঁধা অবস্থায় থাকতে পারে না, গলে যায়। তেমনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভকারীর পক্ষে হিমালয়ের মতো দুর্গম অথবা নীরব নির্জন নিভৃত গুহা প্রান্তরে একাকী থাকা সম্ভব হয় না। ব্রহ্মলোক ছেড়ে মর্ত্যলোকে আসতেই হয় সৃষ্টির গুহ্যতম রহস্য জনসমক্ষে প্রকাশ করার জন্য, লোক শিক্ষার জন্য। এইই হলো শক্তির Capacity।

বর্তমান সমাজে অনেক ভক্ত শিষ্য শিষ্যার দল নিজ নিজ গুরুকে বড় করে তুলে ধরার জন্য জনসমক্ষে ব্রহ্মজ্ঞ হিসাবে তুলে ধরেন। এখানে গুরু করেন চতুরতা বা চালাকির আশ্রয় নেন, নিজে থাকেন নির্বাক। কিন্তু মাটি নরম বা কাঁচা থাকলেই জলে অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা, শক্ত হয়ে ইট হয়ে গেলে ভয় থাকে না। —এটাই তারা জানেন না। এই বিশ্বাস অবিশ্বাসের যুগে একজন সাধক বা প্রতিটি গুরুর উচিত লোক ঠকানোর পথ পরিহার করে সাধন ভজনে যা বা যতটুকু পেয়েছেন তা খোলাখুলি ভাবে জনগণকে জানানো, সত্যের পুরোপুরি আশ্রয় নেওয়া। জনমনে এইরূপ বিভ্রান্তি দূর করার জন্য বিধাতা পুরুষ নিজেই বন্দোবস্ত করে রেখেছেন। যিনি ব্রহ্মজ্ঞ অথবা ব্রহ্মকে জানতে সক্ষম হবেন তার শরীরে বিশেষ কিছু কিছু লক্ষণ বা Symptom দিয়ে রেখেছেন। একটি লক্ষণ,—বৈদ্যুতিক তারে যেমন ফাঁক থেকে গেলে বিদ্যুৎ প্রবাহ ঘটে না তেমনি একজন সাধকের হাঁটু থেকে হাত মাটিতে ঠেকে না গেলে অর্থাৎ স্পর্শ না করলে ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারেন না। যৌগিক পরিভাষায় এরই নাম Earthing হয়ে যাওয়া। অতএব সাধু সাবধান, প্রকৃতি প্রদত্ত ঐ লক্ষণ চেপে রেখে মিথ্যা কথা বলা উচিত হবে কি?

নারীদের পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব কি না?

নারীদের মধ্যে কেহ ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করেছেন বা ব্রহ্মত্ব পেয়েছেন— এরূপ নজির সম্ভবতঃ নেই, কেননা এদের কারো থেকে সৃষ্টি রহস্যের কোনই ব্যাখ্যা আজ পর্যন্ত শোনা যায়নি। ভক্তিমার্গে নারীদের পক্ষে ঈশ্বর দর্শন সম্ভব, কিন্তু জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মত্ব জ্ঞান লাভ তথা সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য

উদঘাটন করা এদের পক্ষে সাধারণ ভাবে সম্ভব নয়। কারণ নারীদের কাঠামোগত শারীরিক গুণ। নারীদের শরীরের অংশে কিছু ঘাটতি আছে, সেই কারণে পুরুষদের তুলনায় মা বোনেদের দৈহিক কাঠামো অনেক কমজোরী যা জ্ঞানমার্গে যাওয়ার পথে বাধা স্বরূপ।

জ্ঞানমার্গে যাওয়ার জন্য যোগিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া অবলম্বনে শরীরে যে চাপ পড়ে, যা ক্ষয়ক্ষতি এবং অস্থিরতার সৃষ্টি হয় তা দৈহিক কাঠামোগত গুণেই নারীদের পক্ষে ধরে রাখা সম্ভবপর হয় না। গ্রীষ্মকালে অত্যাধিক তাপে যেরূপ বহু ছোট ছোট লতা গুল্ম এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী বাঁচতে পারে না, মরে যায়, তেমনি ঐ পরমশক্তির সংস্পর্শে আসতে গেলে নারীদের পক্ষে জীবন টিকিয়ে রাখা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়, জীবন থাকে না, চলে যায়।

অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখানো

আমাদের প্রতিটি মানব শরীরে যে কোনও কিছু নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত ধারণ ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতার বেশী তাপ বা চাপ আমরা নিতে পারি না। আমরা 60 Watt Lamp এর আলো উপভোগ করি। কিন্তু 1000 Watt Lamp-এর আলোতে আমরা প্রত্যেকেই অস্বস্তি অনুভব করে থাকি।

বিশ্বরূপ অতি তেজোময় এক মহান শক্তি, যা সকলের পক্ষে ধারণ করা সম্ভব নয়। যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী অর্জুনের শরীর কাঠামোগত হিসাবে ছিল খুবই মজবুত ও পাকাপোক্ত—আশুরিক শক্তি সদৃশ, অপরদিকে ধর্মভীরু যুধিষ্ঠির এবং অন্যান্য ভাইয়েদের শারীরিক কাঠামো প্রাকৃতিক নিয়মেই ছিল দুর্বল, যা ঐ তেজোময় শক্তি ধারণে সক্ষম ছিল না, জীবনপাত হয়ে যাবার প্রভূত সম্ভাবনাও ছিল। তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি জ্ঞানসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ এই কারণে অর্জুনকেই বিশ্বরূপ দেখালেন অথচ ধর্মপ্রাণ যুধিষ্ঠিরকে দেখালেন না।

মানুষের ভিন্নমুখী বুদ্ধিবৃত্তি — কারণ কি?

সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে সমতার সূত্রের উপর ভিত দিয়ে প্রতিষ্ঠিত মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বেলাতেও তাই। বিশ্বপ্রকৃতিতে চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র সমস্ত কিছুই মহাশূন্যে ভাসমান কিন্তু একে অপরকে ধরে রাখার মূলে আছে একটি মাত্র জিনিস, তা হল সৃষ্টির Balancing System বা ভারসাম্য নীতি। জীবের বেলাতেও এর হেরফের ঘটেনি। খাদ্য খাদক থেকে শুরু করে মানুষের চাহিদা, চিন্তাভাবনা, কাজকর্ম, ধর্মাধর্ম সমস্ত কিছু প্রাকৃতিক পরিবেশ ও নিয়মনীতির উপর খাপ খাইয়ে ঐ সমতা সূত্রের উপর ভিত দিয়ে প্রতিষ্ঠিত।

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি এবং আচার আচরণের বেলাতেও ঐ একই নিয়মনীতি সমভাবে প্রযোজ্য।

অপরদিকে বিশ্বের প্রতিটি জিনিস রূপ রস গন্ধ স্বাদ বর্ণ প্রভৃতিতে অথবা মানুষের আচার আচরণ স্বভাব চরিত্রে যদি বৈচিত্রতা না থেকে যেত তাহলে মানুষের প্রতিটি কাজে উৎসাহ উদ্দীপনা থাকত না। একঘেঁয়েমি এসে যেত, উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেত না। পৃথিবী এত মধুময় হয়ে উঠত না। অন্যদিকে আমাদের সবাইকার একই রকম বুদ্ধিবৃত্তি ঘটে থাকলে আমরা একজন অন্যের প্রয়োজন স্বীকার করতাম না। কাজেই আমাদেরই সুস্থভাবে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে অর্থাৎ আমাদের স্বার্থেই বিভিন্নমুখী বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন আছে ও সংযোজিত হয়েছে।

সবার মূলে বীজ

উপযুক্ত ক্ষেত্র, অনুকূল পরিবেশ ও উন্নতমানের বীজ এই তিনের ঠিক ঠিক মিলনেই সর্বাৎকৃষ্ট ফসল ঘরে তোলা সম্ভব।

আমরা নিজ নিজ প্রচেষ্টায় ও পরিশ্রমের সহায়তায় নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে গড়ে তুলতে বা নিজ নিজ ক্ষেত্র প্রস্তুত করে নিতে পারি। নিজেদের আয়ত্তের বাইরে থাকা প্রতিকূল পরিবেশে অনুকূল পরিবেশে পর্যবসিত করে নিতে পারি, কিন্তু আমাদের স্বভাব চরিত্র, আচার আচরণ সর্বোপরি বুদ্ধিবৃত্তির মূলে থাকা যে বীজগত গুণ তাকে কোনও রকমেই পাল্টে দিতে পারি না। সোনা রূপা পিতল তামা ইত্যাদি বিভিন্ন ধাতব পদার্থের মধ্যে কেবলমাত্র লোহা দিয়ে অতি সহজে যন্ত্র বানানো সম্ভব তার Temper ধরে রাখার প্রকৃতিগত বীজ গুণেই। হাজার রকমের কলা-কৌশলের সহযোগে আমের বীজ থেকে জামগাছের চারা কিংবা হাঁসের ডিম থেকে মুরগির ছানা বের করে দেওয়া সম্ভব নয়। পাঁকের ভিতর পদ্মগাছ তখনি জন্মে যখন ওতে ঐ গাছেরই বীজ থেকে থাকে— কাজেই সবকিছুর মূলে বীজ বা বীজগত গুণ। আমরা জীবকুল বীজ অর্থে আমাদের সূক্ষ্ম অর্থাৎ স্থির কাঠামোটাকেই জানি না, তাই আজ আমাদের এই দুর্গতি, এতোই হেনস্থা। জীবকুলের এই বীজগত গুণ প্রকৃতি প্রদত্ত এবং তা সৌরলোকের গ্রহ নক্ষত্রাদি থেকে পাওয়া। যে কোনও গাছপালা, ফুলফল, পশুপাখী প্রভৃতিকে উন্নতমানের গড়ে তুলতে সবার আগে বীজের দিকে নজর দিতে হয়। প্রয়োজনে অবলম্বন করতে হয় বিশেষ বিশেষ কলা কৌশল। মানুষের বেলাতেও তাই—ধৈর্য, চেষ্টা, একাগ্রতা, অধ্যবসায়, নিজ নিজ কর্ম, ব্যবহার, আচার আচরণ সবেতেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে চলার দরকার।

এতেই ক্ষেত্র ও পরিবেশের সাথে সাথে উন্নতমানের বীজ তৈরি হওয়ার পথ প্রস্তুতি হয়। এইভাবে জন্ম জন্মান্তরের প্রচেষ্টায় মানুষের বীজগত গুণ অর্থে বুদ্ধিবৃত্তি বা বুদ্ধ্যাঙ্কের হেরফেরও ঘটে থাকে।

বিজ্ঞানের প্রভাব যতই বাড়বে ধর্মের প্রভাব ততই কমবে—কথাটি ঠিক কিনা?

আপাতদৃষ্টিতে কথাটি ঠিক মনে হলেও বাস্তবে তা নয় বা হবে না। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের প্রভাব যতই বাড়বে, ধর্মের নামে তথাকথিত কুসংস্কার, অন্ধত্ব, অজ্ঞানতা, অজ্ঞতা, গোঁড়ামি ক্রমে ক্রমে কমতে থাকবে, পরিবর্তে ফুটতে থাকবে ধর্মের আসল স্বরূপটি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যোগাবে অধিকার, ধর্ম বলে দেবে দায়িত্ববোধ। মানুষের মধ্যে যখনি ধর্মের প্রকৃত এই স্বরূপটি ফুটে উঠবে একমাত্র তখনি বোঝা হবে আমাদের সুস্থ সুশৃঙ্খল সমাজ সুন্দর জীবনের জন্য বিজ্ঞানের পাশাপাশি ধর্মেরও সমান দরকার। একমাত্র তখনি সমাজকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে সহজ হবে।

বিজ্ঞান এবং ধর্ম তফাৎ কোথায়?

বিজ্ঞান এবং ধর্ম উভয়ের পিছনে আছে বিশেষ বিশেষ শিক্ষা। একই দুধ—একভাবে ঘি আবার অন্য প্রক্রিয়ায় ছানা, একজনের আছে দাহ্যশক্তি, অন্যজনের মধ্যে আগুনকে নেভানোর বিশেষ ক্ষমতা। দুই জিনিসের গুণাগুণ সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী। অনুরূপভাবে একজন মানুষ বিজ্ঞান শিক্ষা করে একরূপ পারদর্শিতা আবার ধর্মের উপর অনুশীলন কি চর্চা করে অনুরূপ দক্ষতা অর্জন করে থাকেন। উভয়কে সমদৃষ্টিতে দেখা বা সমানভাবে বিচার কার আমাদের বোকামি ছাড়া কিছুই নয়।

বিজ্ঞান এবং ধর্ম উভয়েই ইঙ্গিত দেয় সত্যকে, বলে দেয় বাস্তবতার কথা। বিজ্ঞানের চিন্তাভাবনার সমস্ত কিছু যুক্তিগ্রাহ্যের ভেতরের জিনিসকে নিয়ে, কিন্তু ধর্ম সাধনার মূল উদ্দেশ্য যুক্তি গ্রাহ্যের বাইরের জিনিসকে ধরা। বিজ্ঞান এবং ধর্ম উভয়ের চিন্তাভাবনা নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সেখানে যে যার নিজ নিজ রাজ্যের রাজা।

বিজ্ঞান যেমন কোন ম্যাজিক নয়। তেমনি ধর্মও, এও কোন ম্যাজিক নয়। বিজ্ঞানে অলৌকিকতার কোনও স্থান না থাকলেও ধর্মতে আছে। সাধারণের ক্ষমতার বাইরে বিশেষ ব্যতিক্রম ও অস্বাভাবিক ক্ষমতাকে ধর্মে অলৌকিক ক্ষমতা হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে। মৃতে জীবনদান, একজনের রোগ অন্য

শরীরে নিয়ে নেওয়া, এক জায়গা থেকে অন্যত্র বিচরণ এ'রূপ ঘটনাগুলোকে ধর্মীয় চিন্তাভাবনায় অলৌকিক শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। টাকা পয়সা ওড়া কি ধূপ ধুনার গন্ধ প্রভৃতিকে যেখানে সত্যিকারের মানুষে কোনই কাজ হয় না, প্রকৃত ধর্মে অলৌকিকতা হিসাবে এ'সব চিহ্নিত করা হয়নি।

বিজ্ঞানের ক্ষমতা আছে তার দ্বারা অর্জিত জ্ঞানের ফসল আপামর জনসাধারণের মধ্যে প্রামাণ্য রূপে তুলে ধরার। কাজেই সহজেই আদরণীয় ও গ্রহণীয়। অপর দিকে ধর্ম প্রত্যক্ষ উপলব্ধিগত, সমস্ত কিছু নিজের কাছে ও নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, জনসমক্ষে প্রামাণ্যরূপে তুলে ধরার কোনই ক্ষমতা নেই, কাজেই অবিশ্বাসের চির মোড়কে বাঁধা।

আসলে বিজ্ঞান এবং ধর্ম, এদের কারো মধ্যে কোনও রকম বাদ বিসম্বাদ বা ঝগড়াঝাঁটি নেই, থাকার কথাও নয়। কিন্তু দ্বন্দ্ব আছে, যারা এদেরকে কাজে লাগাচ্ছে সেই সব মানুষ তাদের নিজেদের মধ্যেই—এর প্রমাণ-অপ্রমাণ অথবা বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়েই।

আমাদের সকলের মনে রাখার দরকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এনেছে অধিকার, যেখানে ধর্ম শিখিয়েছে দায়িত্ব বোধ। সুতরাং সুস্থ সমাজ গঠনে উভয়ের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আমাদের বুঝতে হবে, ধর্ম অথবা বিজ্ঞান উভয়ের পিছনে কাজ করছে মানুষ। কাজেই ভুল আছে, যারা এদেরকে কাজে লাগাচ্ছে সেই সে মানুষের মধ্যে, ধর্ম বা বিজ্ঞান এদের কারো মধ্যে নয়।

বিজ্ঞান এবং ধর্ম—সহাবস্থান সম্ভব কি না?

আমাদের অনেকেরই বদ্ধ ধারণা আছে যে ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের সহাবস্থান কোনও দিন সম্ভব নয়। শিল আর নোড়া মিলমিশ হয় না। বিজ্ঞান তার সুফল সর্বসাধারণকে যা দিতে পেরেছে ধর্ম তা পারেনি, কোন দিন পারবেও না। কাজেই উভয়ের অবস্থান দুই বিপরীত মেরুতে থেকে যাবে, সু-সম্পর্ক গড়ে উঠবে না। কিন্তু এ ধারণা ভুল ধারণা, ঠিক নয়। শিল আর নোড়ার পূর্ণাঙ্গ মিলনেই কর্মসিদ্ধি অর্থাৎ বাটনা বাটা সম্ভব।

আমরা দেখি সমাজে শ্রমজীবী এবং বুদ্ধিজীবী এদের উভয়ের চিন্তাভাবনা, কাজ-কর্ম প্রভৃতিতে বিস্তর ফারাক আছে কিন্তু সমাজজীবনে উভয়ের প্রয়োজন কেহই অস্বীকার করতে পারি না, অনস্বীকার্য। তেমনি সমাজ সুন্দর জীবন গঠনে বিজ্ঞানের পাশাপাশি ধর্মের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। আমাদের দরকার একদিকে যেমন বিজ্ঞানের কুফলগুলিকে দূরে সরানো, তেমনি অন্যদিকে ধর্মের গোঁড়ামি, অজ্ঞতা সমূহকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া।

প্রকৃত পক্ষে বিজ্ঞান ও ধর্ম এদের উভয়ের মধ্যে কোনও বাদ-বিসম্বাদ কি ঝগড়াঝাঁটি নেই কিন্তু আছে ধর্ম বা বিজ্ঞান এই উভয়কে যারা কাজে লাগাচ্ছে সেই মানুষ তাদের মধ্যে। বিজ্ঞান যোগাবে মানুষের দেহের খোরাক তথা সুখ ও সমৃদ্ধির যাবতীয় উপকরণ, যেখানে ধর্ম মানব মনের পারস্পরিক ভাঙন রোধ করে এনে দেবে মানসিক সুখ ও শান্তি। বিজ্ঞান এবং ধর্ম যখন এইভাবে একের প্রয়োজন অন্যে স্বীকার করে নেবে তখনি ঘটে যাবে সমস্ত রকম ভেদাভেদ দ্বন্দ্ব এবং ভুল বোঝাবুঝির।

বার্ধক্যের ভাবনা নিরসনে

বার্ধক্যের ভাবনা বড় ভাবনা। ঘুন ধরে গেলে যেমন পাকা বাঁশের দ্বারাও শক্ত বা মজবুত কাঠামো বানানো যায় না তেমনি মানুষের বেলাতেও ঘটে থাকে। চল্লিশ বছর পেরিয়ে গেলেই শক্ত সমর্থ ভরা যৌবনেও ভাঁটার টান আসে, চোখে আসে চালশে, কানে আসে বধিরতা। বল বুদ্ধি ভরসা সমস্ত কিছু এক এক করে ফরসা হতে শুরু হয়ে যায়। এর উপর অর্থের অভাব ঘটলে আর বলার কিছুই থাকে না, একেবারে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা— অতি দ্রুত বার্ধক্য এসে যায়।

বার্ধক্যের ভাবনা বড় ভাবনা, বার্ধক্য কালে নিজের অর্থ ও ক্ষমতা ক্রমশঃ লোপ পেতে থাকে, সবাইকে শিশুর মতো ক্রমে ক্রমে পরমুখাপেক্ষী হয়ে যেতে হয়। নিজ নিজ আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব পরিবার পরিজন সব থেকে প্রয়োজনের এই সময়ে ক্রমান্বয়ে একে একে দূরে চলে যেতে থাকে। এ এক অসহনীয় অবস্থা। এই দুঃসহ অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য এখানে কেবলমাত্র একটিই পথ আছে খোলা যেটি হল ঘুণ ধরা বাঁশ তেল রঙ আলকাতরা দিয়ে ঢেকে দেওয়ার ন্যায় নিজেকে ঈশ্বরীয় চিন্তায় নিমগ্ন রাখা কি ডুবিয়ে দেওয়া। এর জন্য কোন আশ্রম বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত যাতায়াত করতে পারলে খুবই ভাল। সৎসঙ্গের প্রয়োজন সব সময়েতেই অনস্বীকার্য, অভাবে বিভিন্ন ধর্মীয় পুস্তক যেমন বাইবেল কোরাণ বেদ পুরাণ উপনিষদ রামায়ণ মহাভারত গীতা সুযোগ সুবিধা থাকলেই পাঠ করা দরকার। অতি সহজ সরল ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ, বাবা লোকনাথ, স্বামী স্বরূপানন্দ কি ঠাকুর অনুকূলের উপর লেখা গ্রন্থাদি পাঠে ভালো কাজ হয়। অন্ধের যেমন একমাত্র ভরসা লাঠি, যা তাকে চলতে সাহায্য করে—এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় এগিয়ে নিয়ে যায়, কারো সাহায্যের দরকার হয় না, তেমনি প্রতিটি বৃদ্ধ-বৃদ্ধার এখনকার সব থেকে বড় ভরসা বড় সম্বল ১৬ নাম ৩২ অক্ষর ''হরে কৃষ্ণ হরে রাম...'' মহামন্ত্রের পুরোপুরি আশ্রয় নেওয়া। এই আদি ঈশ্বরীয় নাম প্রতিটি

মানুষকে মৃত্যুর মহাভয় কাটিয়ে মনের অস্থিরতা কমাতে সাহায্য করে থাকে, নিঃসঙ্গতা কমায়, ঈশ্বর সমীপে পৌঁছে দিতে দ্রুত সাহায্য করে।

বিদ্যা ও বুদ্ধি — পার্থক্য কোথায়?

বিদ্যা এবং বুদ্ধি এক নয়, কিন্তু লোহার সাথে চুম্বকের ন্যায় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকার সুসম্পর্ক উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান।

বিদ্যা আগে, পরে বুদ্ধি। বিদ্যার দ্বারা বুদ্ধির বিকাশ ঘটে, বুদ্ধিকে উৎসাহ তথা শক্তি যোগায় বিদ্যা, যার অবস্থান পেটে (পেটে বিদ্যা নেই)। পেট আমাদের শক্তিদাতা মানবদেহের রান্নাঘর, বুদ্ধি অবস্থান করে মাথায় (মাথা খুব ভাল)—এ আমাদের পরিচালন কর্তা—মানবদেহের আলোর রাজ্য। যিনি বিদ্যাকে প্রয়োগ করার ব্যবহারিক কৌশল (ভাল অথবা মন্দ) যত বেশী দখলে আনতে পেরেছেন তিনি তত বেশী বুদ্ধিমান।

শরীরে গ্যাসীয় পদার্থ যত কম হয় বুদ্ধির অংশ তত প্রখর হয়। Heat-এ গ্যাস বেশী হয়। গ্যাস বেশী হয়ে থাকলে চঞ্চলতা বাড়ে, ফলে অস্থিরতা বাড়ে। অস্থির মনে কোনও দায়িত্বপূর্ণ কাজ করা যায় না—বুদ্ধির বিকাশে বাধা ঘটে। বুদ্ধির গুরু বৃহস্পতি বিদ্যার গুরু সরস্বতী।

ভক্তি

বিভিন্ন কারণে আমাদের ভক্তি আসে। এর প্রথমটি হল ভয় থেকে, ভয়ে ভক্তি, কিন্তু এরূপ ভক্তিতে আন্তরিকতা থাকে না—লোক দেখানো, সবলের প্রতি দুর্বলের ভক্তি। ভক্তির দ্বিতীয় কারণটি হল স্বার্থসিদ্ধিজনিত, চাওয়া পাওয়ার কারণে, কিন্তু এরূপ ভক্তি অল্পস্থায়ী, কাজ মিটলেই ভক্তিও উধাও। আসল ভক্তি আসে একজনের কর্ম, আচার-ব্যবহার কি জ্ঞানে গুণে আকৃষ্ট হয়ে—এই ভক্তি নিখাদ ভক্তি এরূপ ভক্তিতেই আসে অনুরাগ, আসে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রভৃতি যেখানে মাথা আপনা আপনি নত হয়ে যায়। মানুষের মনে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি এসেছে এ ভাবেই তাঁর মহৎ গুণে, তাঁর উদারতা ও মহানুভবতায় আকৃষ্ট হয়ে।

ভক্তির কাঙাল ভগবান। সেই কারণে কেবল ভক্তির সহযোগেই ভক্তির দেবতা ভগবানকেও পাওয়া যায়, —মিলন ঘটে যায় ভক্ত আর ভগবানে।

ভক্তিতে ভগবান

'ভক্তিতে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর'—ভগবানকে পাবার সহজতম পথ হল ভক্তির পথ, যা শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ভক্তিযোগ বা ভক্তিমার্গে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন।

কলিযুগ বিজ্ঞানের যুগ, এখনকার মানুষ নিজে কাজ করতে উৎসাহী নয়, পরিবর্তে যন্ত্রের দ্বারা অভাবে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে উৎসাহী বেশী। কলিযুগের মানুষ একদিকে মিথ্যাবাদী, কপটাচারী, চতুর, স্বার্থপর, স্বেচ্ছাচারী ও আরামপ্রিয় কিন্তু অন্যদিকে দুর্বল, ক্ষণজীবী এবং ক্ষীণজীবী, এদের পক্ষে দান ধ্যান তপস্যা যাগ যজ্ঞ করা সম্ভব নয়। ভোগ স্বর্বস্য কলিযুগের জীবের এই দুর্দশা হেরে বা লক্ষ্য করে গৌরাঙ্গদেব কলির জীব উদ্ধারে ঈশ্বরীয় নাম গানের মাধ্যমে ভক্তির পথ ধরে হাঁটতে বলেছেন।

কেবলমাত্র ভক্তির পথ ধরে ভগবানের ব্যাকুলতায় একজনের ভাগ্যের পথ খুলে যেতে পারে, ঘটে যেতে পারে ঈশ্বর দর্শনও। কিন্তু যেমন গুড় তেমন মিষ্টি। এই ভক্তির পথে বা প্রেমমার্গে কেবল মূর্তিরূপ দু/একবার ভগবৎ দর্শন হতে পারে এর বেশী কিছু অর্থাৎ সৃষ্টি তত্ত্ব জানা বা সৃষ্টির গূঢ়তম রহস্য ভেদ করা যাবে না, এর জন্য আরো কঠিন পথ ধরে এগোতেই হবে।

ভক্তি মার্গে জপতপ ধ্যান উপাসনা আরাধনা এগিয়ে যাওয়ার পথে প্রধান হাতিয়ার। এখানে আমরা বার-ব্রত করি, ফুল ফল দুধ অন্ন বস্ত্র প্রভৃতি দিয়ে ঠাকুরের পূজা দিই, আরো নতুন নতুন উপকরণে ঠাকুরের নৈবেদ্য সাজাই কিন্তু যারা অর্থের দিক দিয়ে দুর্বল, যাদের পক্ষে পূজা আচ্ছার সামান্য ঐ নৈবেদ্যটুকুও যোগাড় করার সামর্থ নেই তাদের জন্য, "উপাচারের নেই প্রয়োজন, তন্ত্রমন্ত্র সব অকারণ"। —'তুলসী আর গঙ্গাজলে পুজলে নাকি তোমায় মেলে' —কেবলমাত্র গুটী কয়েক তুলসী পাতা আর হাতের কোষভরে একটুকু গঙ্গাজল অঞ্জলি দিলেই যথেষ্ট, কেবল ভক্তি আর নিষ্ঠা থাকলেই হল।

কিন্তু, তুলসী আর গঙ্গাজল যেমন যেখানে সেখানে যখন তখন পাওয়া যায় না তেমনি হিন্দু ধর্মের এই বিশ্বাস সবাই বিশেষতঃ অন্য ধর্মের লোকেরা মন থেকে মেনে নিতে পারেন না। এই কারণে আমাদের সৃষ্টিকর্তা সবার কাছে দিয়ে রেখেছেন অনন্য এক জিনিস, তা হল চোখের জল—"চোখের জলে না ধোওয়ালে দেখা মেলে না তোমার"। এই চোখের জলরূপ সহজ লভ্য জিনিসটি কারো কাছে অভাব নেই, পয়সা দিয়ে কিনতে হয় না, ধার করতেও হয় না, সব সময়েতেই পাওয়া যায়। এখানেই আমাদের সৃষ্টিকর্তার বিচক্ষণতা, তার বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা। আমাদের হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ জৈন্য খিস্ট্রান জাপানী জার্মানী ইহুদী পারসি ধনী নির্ধন গৃহী অগৃহী শিক্ষিত

অশিক্ষিত রাজা বাদসা ফকির ছাত্র শিক্ষক চোর ডাকাত নেশাখোর সবার কাছে আছে। কিন্তু কি জন্য আছে, কীভাবে কাজে লাগাতে হয় কেহই জানি না। আমাদের বিধাতাপুরুষ এ কাজে জাত-পাত, ধর্ম-অধর্ম কোথাও ভেদাভেদ বা ছোটবড় টানেননি। এই সহজলভ্য পূজা উপচারটি দিয়ে রেখেছেন কেবলমাত্র ভগবানকে প্রাণভরে ডাকার ও তার সাক্ষাৎ পাবার জন্য। এই হল ভক্তিতে ভগবানকে পাবার শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য।

ভগবান আছেন — বিশ্বাস আসবে কীভাবে?

ভগবান বা ঈশ্বর আছেন এই বিশ্বাস আসতে পারে একমাত্র বোঝাপড়ায়, আর বোঝাপড়া আসবে একমাত্র শিক্ষার দ্বারা। আমাদের জানা না-জানা সবার মূলে শিক্ষা, সুতরাং আমাদের শিক্ষার পরিধি বাড়াতে হবে। শিক্ষার প্রসারতা বাড়িয়ে যেমন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ প্রভৃতি তেমনি আধ্যাত্মিক শিক্ষার বোঝাপড়া বাড়িয়ে সাধু মুনি ঋষি মহাপুরুষ ইত্যাদি।

ঈশ্বর আছেন—এই বিশ্বাস যুক্তির দ্বারাও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। তারের মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি লুকিয়ে আছে, বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু Electric Lamp-এ আলোর প্রকাশের মধ্য দিয়ে যেরূপ সহজেই জানা যায় তেমনি এই বিশ্বচরাচরের চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা, জল, আলো, পাহাড়, সমুদ্র, বনভূমি, মরুভূমি প্রভৃতি সমস্ত কিছু সৃষ্টির মূলে ব্যক্তি বা শক্তি কারো না কারোও হাত আছে—ধর্মীয় ব্যাখ্যায় একেই ঈশ্বর রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, এই যুক্তি নিয়ে ঈশ্বর বিশ্বাসে আসা সহজ হয়।

নদীর মোহনা থেকে চড়াই পথে এগিয়ে যেমন উৎসমুখে পৌঁছানো সহজ তেমনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে কোনও কিছুর প্রকাশ ধরে এগোতে থাকলে একদিন ভগবান বা ঈশ্বর সদৃশ জিনিসের কাছে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব হয়। তখনি আসে পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস, আর বিশ্বাস পাকাপোক্ত হলে এসে যায় বাস্তবতা।

ভগবানে ডেকে লাভ কি?

ভগবানে ডাকা অর্থে মনের কামনা বাসনা চাওয়া পাওয়া পূরণে প্রার্থনা জানানো, প্রার্থনা জানানো ভাল হওয়া, ভাল থাকার। প্রার্থনা জানানো নিজে ভালো থাকার সাথে সাথে পাঁচজনকে ভালো রাখার, আর ভগবানকে ডাকলেই বুঝা যায় এর লাভ বা ক্ষতির দিক। সেই কারণে কীর্তনীয়ারা প্রায়শই বলে থাকেন—"একবার ডেকে দেখো না"।

দুধের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে বিশেষ বিশেষ গুণ। দুধকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় মন্থন করলেই এর মধ্যে লুকিয়ে থাকা এক একটি গুণ ভেসে উঠে আমরা দুধ থেকে ঘি ননী ক্ষীর ইত্যাদি পেয়ে যাই।

আমাদের প্রতিটি মানবদেহের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে দুধের অনুরূপ বিশেষ বিশেষ গুণ। সেই কারণে এই মানবদেহকে মন্থন করলেই এর মধ্যে লুকিয়ে থাকা এক একটি গুণ ভেসে উঠে। এইরূপে সবার শেষে ঈশ্বর সদৃশ জিনিসটিও ফুটে ওঠে।

মানব শরীরকে মন্থন করার প্রথম সোপানটিই হল নিবিষ্ট মনে অহরহ ঈশ্বরে বা ভগবানে ডাকা বা জপ করা। আর এই ভগবানে একাগ্র চিত্তে ডাকতে ডাকতে আমাদের মন থেকে এটা-ওটা আজে বাজে সব চিন্তা চলে যায়। পরিবর্তে ভেসে ওঠে ঈশ্বরীয় ভক্তি এবং তা থেকে অন্তর্নিহিত এক শক্তি।

আম জাম কাঁঠাল না খেয়ে যেমন এর স্বাদ বোঝা যায় না, জলে না নেমে যেমন মাছ ধরা যায় না, তেমনি ঈশ্বর প্রত্যক্ষ অনুভূতির জিনিস, মন দিয়ে ডাকলে এর সারবত্তা বা ফলাফল ক্রমে ক্রমে একটু একটু করে বোঝা যায়, নতুবা বোঝা যায় না। কাজেই "একবার ডেকে দেখ না"? তখনি বোঝা যাবে এর লাভালাভের সব দিকগুলি।

ভগবান যদি ভালো চান তাহলে খারাপটা রেখেছেন কেন?

প্রশ্নটি খুবই যুক্তিযুক্ত, বিশেষ করে আজকের এই সময়ে। আমরা শুনি ভগবান করুণাময়, মঙ্গলময়, তিনি কৃপাময়, আমাদের সবাইকার মঙ্গল চান। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে ভগবান যদি আমাদের সত্যই মঙ্গল চান তাহলে তিনি বিশ্বের সমস্ত কিছুর ভালোটা সৃষ্টি করতে পারতেন, খারাপটি পাশে রাখলেন বা সৃষ্টি করলেন কেন? এ প্রশ্ন আমার আপনার আমাদের সবাইকার।

এর উত্তরে বলা যায় ভালো অথবা খারাপ, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ সমস্ত কিছুই মানুষের কাছে মানুষের বিচারে। ভগবানের কাছে সুখ দুঃখ, ভালো খারাপ এসবের কোন কিছুই নেই, সবেতেই আছে নির্লিপ্ততা। আমরা ভালো অথবা মন্দ যা কিছু ভাবি বা বলি না কেন তামাম দুনিয়ায় সমস্ত কিছু সৃষ্টির মূলে আছে তাঁর একটিই উদ্দেশ্য যেটি হল জীবের বিশেষতঃ মানুষের প্রয়োজন তথা চাহিদা মেটানো, তাদের সবাইকার সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি।

একটু ভেবে দেখে বলা যায় আমাদের আলোর পাশাপাশি বিশ্রামের জন্য অন্ধকারেরও দরকার। কুজন আছে বলেই সুজন, চোর থাকার কারণেই সাধুর কৃতিত্ব, রাবণের পাশে রাবণারি শ্রীরামচন্দ্র অথবা কংসের পাশে কৃষ্ণের মহিমা। শূন্য বাদ দিলে সমস্ত অংক শাস্ত্র শূন্যতায় পর্যবসিত হয়ে যেত—তাই নয় কি? সুতরাং সৃষ্টির কোনও জিনিস ফেলনার নয়, প্রতিটি জিনিস বা সব কিছুরই প্রয়োজন আছে। আমরা নিজ নিজ বাড়ীতে পায়খানা ঘরের কথা মনে ভেবে নাক সিটকাই, মদ-মাতাল নেশাখোরে বদমেজাজি, বজ্জাত হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকি। চোরকে ঘৃণা করে থাকি। কিন্তু গভীর রাতে আমাদের মল-মূত্র ত্যাগের বিশেষ প্রয়োজনে শোওয়ার থেকে পায়খানা ঘরের প্রয়োজন কি অনুভূত হয় না অনেক অনেক বেশী করে? রাতবেরাতে শ্মশান মশানের মত অস্থানে কুস্থানে অথবা যে কোনও দুঃসাহসিক কাজে বিশেষতঃ কোন দুর্ঘটনা কি প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে উদ্ধারকার্যে বা মোকাবিলায় বুদ্ধিজীবীদের থেকে শ্রমজীবীরা তথাকথিত মদ-মাতাল নেশাখোরেরা প্রাণের মায়া ত্যাগ করে সবার আগে এগিয়ে কি আসে না? এদেরকেই হাতের কাছে পেয়ে ভরসা পাই। চোরকে চুরি ডাকাতি করার অপরাধে আমরা সাজা দিই, আমরা সমাজের একদলকে মাওবাদী নকশালপন্থী, সন্ত্রাসবাদী আলফা জঙ্গী প্রভৃতি উগ্রপন্থী হিসাবে আখ্যায়িত করেছি, ওদের কাজে সাজা দিতে আমরা ব্যগ্র হই। কিন্তু ওদের ভিতর যে উৎকৃষ্ট গুণাবলী লুকিয়ে আছে তা জনজীবনে কীভাবে কাজে লাগানো যায় এ-সব ভাবতে উৎসাহ বোধ করি ক'জন? কাজেই আমাদের সর্বত্রই বোঝাপড়ার অভাব।

ঐ বোঝাপড়ার পরিধি বাড়িয়ে নিলে জানা যায়—আমাদের রজঃগুণে অহংকারেরও দরকার আছে এবং তা থাকবে নিজে বড় হয়ে অপরকে বড় করে গড়ে তোলার জন্য, কিংবা প্রতিযোগিতা থাকবে পরস্পর পরস্পরে এগিয়ে দেওয়ার জন্য, কাউকে পিছিয়ে দেবার জন্য নয়। তমোগুণে হিংসা থাকবে প্রকৃতির বিরুদ্ধে শক্তিকে জয় করার জন্য, অপরকে বিপদে ফেলে দেওয়া বা মনুষ্য সমাজকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য নয়। মিথ্যা থাকবে অন্যকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য, নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নয়। আমাদের চতুরতা থাকবে প্রকৃতির কাছে তাকে কব্জা করে কাজে লাগানোর জন্য, মানুষকে কব্জা করার জন্য নয়। সত্ত্বগুণে আমাদের সরলতা ভাব ভালবাসা উদারতা থাকবে অপরের বিপদের সময়ে পাশে দাঁড়ানো বা দুঃখের সময়ে শান্তির প্রলেপ দেওয়ার জন্য, কিন্তু অপরকে ঠকানোর জন্য বা অন্যের থেকে সুযোগ নেওয়ার জন্য নয়—ইত্যাদি ইত্যাদি।

আরো জানা যায়—গ্লাস থালা বাসন ভেঙে গেলে আমাদের ক্ষতি, গাছ ঝড়ে পড়ে গেলে আমাদেরই ক্ষতি, কিন্তু শিশু মারা গেলে আমাদের থেকে প্রকৃতিরই ক্ষতি বেশী, যেহেতু তার প্রয়োজনেই তিনি সৃষ্টি করেছেন। আমরা রক্ষা করতে পারি না আমাদের দোষ ত্রুটির জন্যই।

সাধন ভজনে সৃষ্টি রহস্য ভেদ করার পরই একমাত্র জানা যায় সৃষ্টির ঐ সমস্ত গোপন রহস্যের কথা এবং তখনি বোধে আসে ঈশ্বর সত্যই মঙ্গলময়, তিনি আমাদের একজনেরও ক্ষতি চান না, সকলেরই মঙ্গল চান। আমরা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে বৃথাই তাঁর উপর ও তাঁর কাজে দোযারোপ করে থাকি।

ভাগ্য

আমরা যখনি কোন না কোনও ক্ষতিতে পড়ে যাই তখনি ভাগ্যের দোষ দিই। লাভজনক কাজে ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলে থাকি অনুরূপভাবে অলাভজনক কাজে দুর্ভাগ্য বলে থাকি। কিন্তু লাভ এবং লোকসান এই দুই-ই সৃষ্টির নিয়মে তৈরি, এই নিয়মেই সৃষ্টির আবহমান কাল ধরে প্রতিটি ক্ষেত্রে দুই বিপরীতমুখী ধর্ম পরস্পর কাজ করে চলেছে। এই নিয়মেই আলোর পিছনে অন্ধকার, সাদার পাশে কালো, দিনের পর রাত্রি বা রাত। ঐ একই ভাবে মানুষের কাজকর্মের মধ্যেও এসে গেছে পারস্পরিক বিপরীতমুখী চিন্তাভাবনা তথা ক্রিয়া প্রক্রিয়া—আমরা একদল ভাগ্য মানি, ভাগ্যের দোহাই দিই, ভাগ্যের পরিহাস অথবা সুপ্রসন্ন ভেবে থাকি, আমরা অন্যদল এর অস্তিত্ব স্বীকার করি না। দড়িকে সাপ ভেবে থাকলে ভয়ের কিছুই থাকে না, কিন্তু উল্টোদিক অর্থাৎ সাপকে দড়ি ভাবলে সমূহ বিপদ, সমূহ ক্ষতি। অনুরূপভাবে আমাদের সুস্থ সুন্দর ভাবে বেঁচে থাকার জন্য ভাগ্যকে যদি না মেনে থাকি তাহলে ক্ষয়ক্ষতির কিছুই থাকে না, কিন্তু অন্যদিকে আমরা প্রত্যেকে কর্মকে না মেনে যদি অলসতা ও ফাঁকি দিয়ে জীবন কাটাই বা জীবনযাত্রা নির্বাহ করি তাহলে আমাদের সমূহ ক্ষতি, আমাদের পতন অবশ্যম্ভাবী, —এখানে ভাগ্যের দোষ দেওয়া বোকামী ছাড়া কিছুই নয়। আমরা ভাগ্য, নসিব বা অদৃষ্টের স্থান হিসাবে কপালে হাত ঠেকাই কারণ কপালেই সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যের বোঝাপড়া—জ্ঞানচক্ষুর স্থান, ঐ জ্ঞান চক্ষুতেই প্রকৃত তথ্য ধরা পড়ে। এখানেই জানা যায় প্রকৃত ভাগ্যবান তিনি, যিনি ঈশ্বরের স্বরূপ জেনেছেন বা ধরতে পেরেছেন। তাঁর উপর কর্মাকর্ম সমস্ত ফলাফল নিবেদন করে নিজে কর্মের পথ ধরে কর্মী হয়ে বসে রয়েছেন।

মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য গড়ে নিতে পারে — ঠিক কিনা?

মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণ কর্তা—কথাটির মধ্যে কোনও ভুল নেই, কথাটি ঠিক।

পঞ্চভূতে তৈরি আমাদের মানবশরীর। এখানে আছে পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং চারটি অন্তরিন্দ্রিয়। আমাদের উন্নতি এবং অবনতি এই চোদ্দটি ইন্দ্রিয়ের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। এগুলিকে যিনি যত বেশী সু-কাজে অর্থাৎ গঠনমূলক কাজে লাগাতে পারেন তিনি তত বেশী উন্নতির সোপান শীর্ষে উঠতে সক্ষম হন। কাজেই আমরা যাকে সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য বলে থাকি তা আমাদের নিজের হাতে, নিজ নিজ চিন্তাভাবনা ও কর্মের উপর নির্ভরশীল।

কিন্তু না, এতেও হবে না—কারণ বীজগত গুণ। নিজ প্রচেষ্টায় ইন্দ্রিয়সমূহকে ঠিক ঠিক কাজে লাগিয়ে সঠিক চিন্তাভাবনায় আমরা ক্ষেত্র প্রস্তুতি এবং অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে পারি, কিন্তু উন্নত মানের বীজ না হলে ভাল ফসল ফলবে না। একজন এক ঘন্টা সময়ে যে উন্নত মানের কাজ সুষ্ঠুভাবে শেষ করতে পারেন বা যে পড়া তৈরি করতে পারেন, অন্যজন দ্বিগুণ সময়েও সমস্ত কিছু পরিবেশ বা পরিস্থিতি একই রেখে তা পারেন না, কারণ ঐ বীজের গুণ। একই কারণে একজন কারিগর কাঁচা লোহা আর ইস্পাতে সমান ধার তুলতে পারেন না অথবা একটু চেষ্টা করে আমরা সবাই মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক বা B.A, B.Sc, B.Com. এর মতো সাধারণ ডিগ্রিসমূহ পেতে পারি কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও তামাম দুনিয়ার সবাই Research Scholar কি Scientist হয়ে উঠতে পারি কি? এ চিন্তা সৃষ্টির নিয়মের পরিপন্থী চিন্তা।

কিন্তু সৃষ্টি রহস্যের গভীরে ঢুকলে দেখা যাবে মানুষের হাতেই সব অর্থাৎ একজন নিজে তার নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ কর্তা বা নিয়ন্ত্রক, ভাঙা এবং গড়া পুরোপুরি নিজের হাতে। প্রকৃতি বা ঈশ্বর এখানেও কারো প্রতি কোনও রূপ বৈষম্য বা বিভেদমূলক আচরণ করেননি। একজন নিজ প্রচেষ্টার দ্বারা মূর্খ থেকে মেধাবী পর্যন্ত হতে পারেন অর্থাৎ তার বীজগত গুণ পাল্টে দিতে পারেন। এর জন্য কেবল দরকার গভীর নিষ্ঠা, কঠোর অধ্যবসায় ও আত্মপ্রত্যয়ের সাথে নিজ নিজ কর্তব্য কর্মে ব্রতী হওয়া। সেখানে আকাঙ্ক্ষিত ধন পেতে এক জন্ম ছাড়িয়ে পর জন্মও চলে যেতে পারে এইটুকু মাত্র।

ভুল

আপাত দৃষ্টিতে আমরা ইচ্ছা করে ভুল করে থাকি মনে হলেও বাস্তবিক পক্ষে তা নয়, আমরা ইচ্ছা করে কেহ ভুল করি না। ভুল করে থাকার পিছনে কোন না কোনও কারণ থাকে। আমরা সাধারণতঃ ভুল করে থাকি অশিক্ষায়, অজ্ঞানতায়, ভুল করে থাকি অসাবধানতায়, ভুল করে থাকি বার্ধক্যকালে।

কাজেই কোনও মানুষ সব দিক দিয়ে Perfect নয়, কোথাও না কোথাও কিছু না কিছু ভুল থাকবেই। এই ভুল করেছেন অবতার শ্রীরামচন্দ্র বালি বধ করে, সত্যবাদী যুধিষ্ঠির ক্ষণিকের মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে, দ্রোণাচার্য জাতের বিচারে একলব্যকে শিক্ষাদান থেকে বিরত থেকে, রাজা বালি অপাত্রে দান করে, আর দাতা কর্ণ দানের বড়াই করে। কাজেই মানুষ ভুল করবে নতুবা সৃষ্টর সাথে সৃষ্টিকর্তার কাজের যে কোনই তফাৎ থাকবে না। একমাত্র স্রষ্টার কাজই নিখুঁত। আমরা না জেনে বৃথাই তাঁর সম্বন্ধে দোষারোপ করে থাকি। মানুষের সমস্ত রকম ভুল করার পিছনে আছে শুধুমাত্র একটি কারণ, যেটি হল নিজ নিজ দেহ কাঠামোগত গুণ। আমরা পৃথিবীর আবহাওয়ামণ্ডল জল মাটি ও বাতাস থেকে যে দেহ পেয়েছি ও লালিত পালিত হয়ে চলেছি তার গুণই হল প্রাণীকুলকে কোনও সময়েই সত্যের কাছে পৌঁছাতে না দেওয়া। কিন্তু সমস্ত ভুল থেকে নিস্তার বা অব্যাহতি পাবার জন্য আমাদের সামনে একটিমাত্র পথই রয়েছে খোলা, তা হল সত্যকে জানা। যা বাস্তবে সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং আমাদের সাধারণের কাজ ন্যায় পথে চলা, সৎ কর্ম, সৎ চিন্তা, সৎ সঙ্গ করা—এগুলোর দ্বারা ভুলের থেকে পুরোপুরি নিষ্কৃতি পাওয়া না গেলেও পরিধি কমানো সম্ভব।

ভুলের সাজা

প্রাকৃতিক নিয়ম এমনি যেখানে ভুলের কাছে কোনও ক্ষমা নেই। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বেই। সাধু গৃহী রাজা বাদশা ফকির শিশু বৃদ্ধ বৃদ্ধা কারো ক্ষমা নেই। ভুল এমনি এক জিনিস একদিন না একদিন ফুটে উঠবেই, গুণতে হবে মাশুল, এই ভুলের ব্যাপ্তি তথা প্রসারতা অনুযায়ী কম বেশী সাজা। এই সাজা নিজ ছাড়িয়ে Generation-কে পর্যন্ত বিঁধতে পারে, চলে যেতে পারে এক জন্ম ছাড়িয়ে পর জন্ম পর্যন্ত।

মানুষ ভুল করবেই, একমাত্র ঈশ্বরের কোন কাজে ভুল নেই। এই জন্যই তার এত দাম। অন্যদিকে তিনি অতি মহৎ, সেই কারণে কেহ যদি ভুল

কাজের জন্য অনুশোচনায় ভুগতে থাকেন অথবা তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন তিনি তা বিবেচনা করেন, তার আশ্রিতদের সাজার পরিমাণও কমিয়ে দেন। এই কারণে আমরা জীবনভর যা ভুল করে থাকি তার সাজা লাঘবে পৃথিবীর সব ধর্মে মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি কামনায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার ব্যবস্থা আছে।

ব্যাবহারিক জগতে সমস্ত রকম ভুলের থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য আমাদের দরকার প্রকৃতিকে অনুধাবন করে চলা, ঈশ্বরাভিমুখী হওয়া। সৎ কর্ম, সৎ চিন্তা, সৎ পরামর্শ প্রভৃতি সব রকম সৎ কাজে যত শীঘ্র সম্ভব নিজেকে নিয়োজিত করা, ভুল শোধানোর সুযোগ থাকলে কাল বিলম্ব না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভুল শোধরে নেওয়া বা দেওয়া।

ভয়ের কারণ

আমরা ভয় পেয়ে থাকি, আমাদের মনে ভয় জাগে। আমাদের বিভিন্ন জনের কাছে ভয় পাবার কারণও থাকে ভিন্ন ভিন্ন—আমাদের ভয় আসে ভুল কাজের সাজা বা শাস্তির পরিমাণ না জানাতে, গৃহীর কাছে টাকা পয়সার অভাবে আগামীদিনে কেমন করে চলবে তা ভেবে, পরীক্ষার্থীর কাছে পরীক্ষার ফলাফলে, বাদী-বিবাদীর কাছে মামলা মোকদ্দমায় হারা-জেতার প্রশ্নে, রোগীর কাছে রোগ থেকে অব্যাহতির অনিশ্চয়তায় ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সমস্ত রকম ভয় পাবার কারণগুলিকে একত্রিত করে দেখা যাবে এদের মূলে আছে একটি মাত্র কারণ, যেটি হল অজানাকৃত ভয়—অর্থাৎ যে কোনও কাজের বিশেষ করে অর্থাৎ কৃতকর্মের ফলাফল সম্বন্ধে আগে ভাগে না জানা। বিয়ের পর নতুন বধূ নিজ শ্বশুরবাড়ী যেতে ভয় পায় কারণ শ্বশুরবাড়ীর পরিবেশ পরিস্থিতি, ওখানকার লোকজনের আচার আচরণ সম্বন্ধে না জানা, কিন্তু কয়েকবার যাতায়াতের পর অথবা আগে ভাগে স্বামী স্ত্রী পরস্পর ভাব-ভালবাসায় আবদ্ধ হলে এ ভয় থাকে না, অনেকটাই কেটে যায়। অবশেষে সব যখন জানা শোনা হয়ে যায় তখন আর ভয় বলতে কিছুই থাকে না।

আমরা সব থেকে বড় ভয় পাই মৃত্যুকে—কারণ পূর্ব বর্ণিত ঐ অজানাকৃত ভয়। আমরা যদি মৃত্যুর পরের জগৎ বা পরের অবস্থা এখান অর্থে এই পৃথিবী থেকে আগে ভাগে অবগত বা ওয়াকিবহাল হতে পারতাম তাহলে ঐ ভয় কেটে যেত, থাকত কি?

সৃষ্টির প্রয়োজনেই সমস্ত কিছুতেই ভাল এবং মন্দ পরস্পর বিপরীতমুখী দিক আছে ও কাজ করছে। ভয়ের বেলাতেও তাই। সমাজ জীবনে সুস্থ ভাবে

আমাদের বেঁচে থাকার জন্য ভয় থাকারও প্রয়োজন আছে। পরীক্ষায় ফেলের ভয় থাকার কারণে আমরা পড়াশুনা করি, ভয় আছে বলেই আমরা প্রত্যেকেই আগে থেকে সাবধান ও সতর্ক হয়ে চলি। দৈহিক পীড়া ও মানসিক যাতনার ভয় থাকার কারণে আমরা উচ্ছৃঙ্খল হতে পারি না। সৃষ্টিকর্তার এ এক অভিনব লীলা রহস্য।

মৃত্যুভয়—মহাভয় কাটাতে

সৃষ্টির নিয়মে প্রতিটি জীবের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, অবধারিত। এর থেকে অব্যাহতি বা পরিত্রাণ পাবার কোনও উপায় নেই।

কিন্তু এই পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণের স্বাদ খুবই লোভনীয় উপভোগ্য বৈচিত্রতায় ভরা এবং মনোমুগ্ধকর ও আকর্ষণীয়। সেই কারণে এই মোহময় পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে আমরা সুস্থ সবল দেহযুক্ত মানুষ কেহই মরতে চাই না। রবীন্দ্রনাথের কথায়—''মরিতে চাহি না আমি সুন্দর এ ভুবনে।'' কিন্তু ''জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা রবে''? সুতরাং জন্ম যখন হয়েছে তখন মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার কোনও উপায় নেই। এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে একদিন চলে যেতেই হবে, আর এই কারণেই আমাদের বড় ভয় মৃত্যুভয়।

মানুষের এই অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করে চৈতন্যদেব স্বয়ং কলির জীব উদ্ধারের জন্য ''হরে কৃষ্ণ হরে রাম''—এই নাম প্রচার করে গেছেন। এই মিলন মধুর নাম-গান জীবের মৃত্যুভয় কাটিয়ে ওঠার তরণ তারণ মহামন্ত্র। যেহেতু প্রকৃতির বুকে পৃথিবী ও মানুষ উভয়ের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল করে এই নাম তৈরি সেইহেতু এই সহজ সরল নাম অবিরাম জপ করে আমরা অতি সহজে সমস্ত রকম বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে উঠতে পারি, যা অন্য কোনও ভাবে বা নামে হয় না। চৈতন্যদেব প্রচারিত ঐ মিলন মধুর নামটি বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের সবাইকার জানা, যেটি হ'ল —

''হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।''

এই নাম জপ করার জন্য কোনও স্থান কাল পাত্র ভাবাভাবির দরকার নেই, মঠ মন্দিরেও যেতে হয় না, কেবল মনের মন্দিরে সর্বদা জপ করতে থাকা।

এই নাম বিশ্লেষণ করে দেখা যায়—

(১) এর মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ৩টি নাম হরি (হরে) রাম এবং কৃষ্ণের নাম বারংবার উচ্চারিত হয়েছে—কিন্তু কেন?

ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগে পৃথিবীর বুকে আমরা মানবরূপে অবতারদ্বয় শ্রীরাম এবং শ্রীকৃষ্ণকে পেয়েছি, যার মূলে সত্যযুগে ছিলেন শ্রীহরি বিষ্ণু। এরা তিন জন প্রত্যেকেই বিশেষ বিশেষ শক্তির অধিকারী ছিলেন। এরা নিজ নিজ কর্ম ও আচরণবিধি পালনের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্যকর্ম সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়ে গেছেন। অন্যদিকে জল, মাটি ও বাতাস এই তিনের সহযোগে গঠিত পৃথিবীর কাঠামোর অনুকরণে যথাক্রমে রক্ত মাংস ও অস্থি এই তিনের সহযোগে গঠিত মানবদেহ কাঠামো যার মধ্যে ক্রমান্বয়ে রজঃ তমঃ ও সত্ত্ব এই তিন গুণ লুক্কায়িত রয়েছে।

মানবদেহরূপ কাঠামোটি যে প্রাণবায়ুর দ্বারা পরিবেষ্টিত তার মধ্যেও আছে ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিন প্রবাহ পথ, আর আছে বাত পিত্ত এবং কফ নামক তিন অবস্থা জ্ঞাপক ধমনী।

সর্বোপরি জীবদেহের তিন অবস্থা—জন্ম, বৃদ্ধি এবং মৃত্যু চক্রের পুরো System-টির মূলেও আছে তিনটি জিনিস—ঈশ্বর, তাঁর সূক্ষ্ম প্রকৃতি ও স্থূল প্রকৃতি। এই সত্য জিনিসটি আমরা জানতে পেরেছি সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের তিন দেবতা যথাক্রমে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের কাছ থেকে, যাদের মধ্য দিয়েই ঘটেছে মানব মূর্তির প্রথম প্রকাশ। এই তিন মানবমূর্তিকে একত্রিত করলেই God অর্থাৎ G—Generation (সৃষ্টি) O—Organisation (স্থিতি) এবং D—Destruction (লয় বা ধ্বংস)। উপরিল্লিখিত ঐ তিনের সাথে মিল করে পুষ্পাঞ্জলি, হাতেখড়ি দেওয়ার ন্যায় আমাদের বহু অনুষ্ঠানে একই জিনিস কমপক্ষে পর পর ৩ বার অনুশীলনের প্রচলন আছে।

(২) ঐ 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম'—এর মধ্যে তিন মহাত্মনের নাম উচ্চারিত হয়েছে মোট ১৬ বার — যেহেতু আমাদের মানবদেহ কাঠামোটিও ১৬টি কলার সহযোগে গঠিত। তন্ত্র শাস্ত্র মতে ১৬টি নাড়ির মিলনস্থল হল আমাদের নাভিমূল।

(৩) হরি, রাম এবং কৃষ্ণ এই তিনটি নাম প্রতিটি ২-অক্ষর বিশিষ্ট। এর পিছনে থাকা রহস্যটি হল—প্রকৃতি পৃথিবী এবং তার বুকে থাকা জীবকুল সৃষ্টির পুরো System-টি একদিকে 'ভাঙা' এবং অন্যদিকে 'গড়া', যার মূলে আছে 'চাপ' ও 'তাপ' এই দুইয়ের মধ্যে ধরা। আমরা প্রতিটি 'নর' 'নারী' যে মানবদেহ পেয়ে থাকি তার পিছনে আমাদের 'পিতা' এবং 'মাতা' এই

দুইয়ের যথাক্রমে ভাঙা এবং গড়ার সম্পর্ক অনস্বীকার্য। "Every action there is equal and opposite reaction"—প্রকৃতির ভাঙা গড়ার System থেকেই এসেছে।

(৪) পূর্বোক্ত ঐ ষোলটি নামে মোট বর্ণ বা অক্ষরের সংখ্যা ৩২টি। আমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণ অবস্থায় বত্রিশটি নাড়ীর বন্ধনে আবদ্ধ থাকি।

(৫) এই তিনটি নামের ভেতর কেবলমাত্র হরি শব্দটি সংযোজিত হয়েছে মোট ৮ বার। আমাদের মানবদেহে আছে পায়ের দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি, দুই হাঁটু, দুই হাত, বুক ও নাক এই আটটি সাধারণ অঙ্গ। (মতান্তরে জানু চরণ হস্ত বক্ষ মস্তক চক্ষু দৃষ্টি ও বাক্য এই আটটি অঙ্গ) এইগুলির সবগুলিকে একসাথে মাটিতে ঠেকিয়ে আমরা গুরুজন ও ইষ্টদেবতায় শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার অর্ঘ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাই।

অন্যদিকে যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধ্যান ধারণা ও সমাধি—এই আট রকম যোগ সাধনায় মানবদেহের দুই হাত হৃদয় কপাল দুই চোখ বাক্য (মতান্তরে কণ্ঠ) মন (মতান্তরে মেরুদণ্ড) এই আটটিকে কাজে লাগিয়ে আমরা সৃষ্টির উৎসস্থলেও পৌঁছে যেতে পারি।

(৬) এখানে কৃষ্ণ ও রাম এই দুই রাজাধিরাজের নাম উচ্চারিত হয়েছে ৪+৪ মোট ৮ বার। আমাদের অষ্টাঙ্গের সহযোগে গঠিত মানবদেহ কাঠামোর মূলে আছে একদিকে বীজরূপ পিতৃশক্তি ও ক্ষেত্ররূপ মাতৃগর্ভ। এই চারটি জিনিস এবং অন্যদিকে প্রাণ ও মনের সাথে শ্বাস ও প্রশ্বাস এই চারটি — সমস্ত মিলিয়ে মোট আটটি মূল জিনিস।

আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা রোগী ভোগী বাদশা ফকির যুবক যুবতী সাধু গৃহী আস্তিক নাস্তিক বিশেষ করে যাদের কাছে পরপারের ডাক এসে গেছে কিংবা আজ বাদে কাল যাদের পৃথিবীর সব রকম মায়া কাটিয়ে চলে যেতে হবে সেই সকল বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলের রোগ শোক দুঃখ কষ্ট চিন্তাভাবনা জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য কলিযুগে সর্বোৎকৃষ্ট এই নাম। এই নাম গানে একবার আসক্তি ঘটলে আর ভয়ের কিছুই থাকে না, মন থেকে সব রকম ভয় ক্রমে ক্রমে লোপ পেতে থাকে। সাবানের দ্বারা যেমন জামা কাপড়ের ময়লা দূর হয়, তেমনি এই নাম অহরহ ভজনে রক্ত বিশুদ্ধ হয় মনের ময়লা দূর হয়। এই নামেতে মজলে তমোগুণও চলে যায়। মন থেকে দূরে চলে যায় সমস্ত রকম কামনা ও বাসনা, ঘটে যায় মোহমুক্তি, হয় ঈশ্বর দর্শন।

কথিত আছে যে এই নামের গুণে শিলা জলে ভাসে, বোবায় কথা বলে, অর্থাৎ অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করা যায়। বাস্তবিক পক্ষে সংসারাঘাতে

পঙ্গু, হিংসা-বিদ্বেষ, বাদ-বিসম্বাদ, কামনা-বাসনা, অকর্ম, কু-কর্মে জরাজীর্ণ এই মানব শরীরকে পরিশোধন করার এই সহজতম একটি মাত্র পথ ঐ ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরযুক্ত প্রেম মাধুর্য ঐ নামের আশ্রয় নেওয়া। দস্যু রত্নাকর ঐ মহৎ 'রাম'(মরা) নামের গুণেই মহামুনি বাল্মীকি রূপে বিশ্ববন্দিত, অসম্ভবকে পরিণত করেছেন সম্ভবে। বর্তমান প্রমাণের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ানো এই বিজ্ঞান নির্ভর জগতে ঐ ঈশ্বরীয় নাম নীরবে মনের গোপনে চুপচাপ একাকী জপ করাই শ্রেয়, নতুবা তাচ্ছিল্য, উপেক্ষা ও অবহেলার শিকার হয়ে যাবার প্রভূত সম্ভাবনা, হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা ধৈর্য, নিষ্ঠা ও মনোবল থেকে শুরু করে ঈশ্বরীয় পথে এগিয়ে যাবার সমস্ত কিছু।

যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না, সাধারণভাবে তাদের কাছে ঐ নামে ভক্তি আসবে না, ভক্তি না আসাই স্বাভাবিক। তাদের দরকার নিজ নিজ কর্তব্যকর্মে ব্রতী হওয়া, এতেও কাজ হবে। কারণ ধর্মের মূল ভিত কর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত, ব্যবহারিক জগতে ধর্ম না হলেও আমাদের চলে যাবে, কিন্তু কর্ম না হলে আমরা বাঁচবো না। কিন্তু সাবধান, প্রতিটি কর্মই সৃষ্টি রক্ষার অনুকরণমুখী হওয়া চাই, পরিপন্থী যেন না হয়।

ভূত প্রেত পিশাচ বাস্তবে আছে কিনা?

ভূত প্রেত পিশাচ অপদেবতা—এসব নিয়ে মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। এই কৌতূহল চিরকালের চিরদিনের। সমাজে যারা সাধারণতঃ দুর্বলচেতা তারা এ'সবের অস্তিত্বে পুরোপুরি বিশ্বাসী। অন্য এক যুক্তিবাদী বিশেষতঃ বিজ্ঞান মনস্কের দল এ'সবের অস্তিত্ব ফুৎকারে উড়িয়ে দেন, আদৌ বিশ্বাস করেন না। এরও বাইরে আছেন আরো একদল যারা সমাজে জ্ঞানীগুণী নামে সমাদৃত তারা জানতে চান এর আসল রহস্য। একমাত্র সৃষ্টি রহস্য ভেদ করতে পারলে এর আসল রহস্যের কিনারা করা সম্ভব নতুবা নয়।

(১) সৃষ্টির নিয়মের পরিপন্থী খুবই গর্হিত কর্ম বা কু-কর্ম করে অথবা অন্য কোনও জানা বা অজানা কারণে কেহ হঠাৎ আত্মঘাতী হয়ে মারা গেলে, মৃত্যুর পর ঐ ব্যক্তি তা বুঝতে পেরে ভুল শোধরানোর জন্য আবার পৃথিবীর বুকে ফিরে আসতে চায় পেতে চায়, মানবদেহ, অথবা—

(২) কোনও দুর্ঘটনা জনিত কারণে কেহ অকালে মারা গেলে, ঐ ব্যক্তি আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হওয়ার কারণে আবার পৃথিবীর বুকে মানবদেহে আসতে চায়। অথবা—

(৩) পর্যাপ্ত ভোগ্য সম্পদ থেকেও রোগ ব্যাধি অথবা অন্য কোনও কারণে বঞ্চিত হয়ে কোন নারী অথবা পুরুষ মারা গেলে—ভোগ্য সম্পদ পুনরায় ভোগ করার বাসনা হেতু ঐ মৃত ব্যক্তির সূক্ষ্মদেহ পৃথিবীর বুকে স্থূলদেহে আবার ফিরে আসতে চায়, পেতে চায় মানব জীবন।

পৃথিবীর বুকে আবার মানবদেহ নিয়ে ফিরে আসা—এই অভিলাষ পূরণে মৃত ব্যক্তি অশরীরী আত্মা রূপে বাড়ীর আনাচে কানাচে অথবা বন্ধু-বান্ধব প্রিয়জনদের আশ-পাশে ঘুরতে থাকে। আর এখানেই ঘটে যায় বিপত্তি। শিশু যেমন কোনও অচেনা ব্যক্তির হঠাৎ উপস্থিতিতে ভয় পেয়ে চমকে ওঠে ঠিক তেমনি দুর্বলচেতা নরনারী ঐ অশরীরী আত্মার সংস্পর্শে ভয়ে আঁৎকে ওঠে। অন্যেরা না দেখতে পেলেও সে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত ব্যক্তির ন্যায় হুবহু স্থূল শরীরে দেখতে পায়। একেই আমরা ভূত দেখা বা ভূতে পাওয়া বলে থাকি। শিশুর মধ্যে কামনা বাসনা থাকে না সেই কারণে কোনও শিশুর মৃত্যুর পর সে কাউকে ভূত হিসাবে ধরে না বা দেখা দেয় না। এই কারণে ভূতের গল্পে শিশু ভূতের কোনও অস্তিত্ব স্থান পায়নি। ঐ অশরীরী আত্মাসমূহ নিম্ন শ্রেণীর আত্মা, কিন্তু মানুষের অনিষ্ট সাধন বা ক্ষতি করতে চায় না, কেবল পৃথিবীর মাটিতে ফিরে আসতে চায়। কিন্তু ঐ অপদেবতার স্পর্শে একজন সুস্থ ব্যক্তি ভয়ভীতি জনিত কারণে সর্বদা অস্থিরতায় ভুগতে থাকে। ফলে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে এবং কালক্রমে অসুখ বিসুখে পড়ে যায়। যথা সময়ে চিকিৎসা বা ব্যবস্থাদি না নিলে মারাও যেতে পারে।

আজ থেকে ৪০/৫০ বছর আগেও গ্রামে গঞ্জে ভূতে ধরা ঘটনাগুলো হামেশাই দেখা বা শোনা যেত খুব বেশী করে। আজ পৃথিবীর বুক থেকে বহু পশুপাখী লোপ পাবার ন্যায় পরিবেশ গত কারণে ঐ সকল ঘটনাও বহুলাংশে কমে গেছে। একদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দৌলতে মানুষের মনে ক্রমাগত সাহস বৃদ্ধি, অন্যদিকে রেডিও, টেপ্, টিভি প্রভৃতি থেকে ধর্মীয় অনুষ্ঠান সমূহ বিভিন্ন সময়ে প্রচার এদের সুস্থভাবে চলাফেরার পথে বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর সাথে বর্তমানে খুব বেশী করে যুক্ত হয়েছে গ্রাম ও নগরগুলিতে উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরীয় নাম গান, অহরহ গুণকীর্তন ও হরিনাম সংকীর্তন। ফলে প্রতিকূল পরিবেশগত কারণে ঐ সকল ভূত প্রেত পিশাচ তথা নিকৃষ্ট আত্মার দল লোকালয় ছাড়িয়ে দূরের বায়ুমণ্ডলে চলে গেছে। অতৃপ্তিজনিত কারণে ক্ষণিকের মানবদেহ পাবার অভিলাষে ঘটেছে ছেদ তথা সমাপ্তি, পৃথিবীর বুকে কমে গেছে অতীতের ভূত প্রেতের উপদ্রব তথা হয়রানি।

মন

আমরা মন নিয়ে অনেক কথা বলে থাকি, অনেক ভাবনা চিন্তা করি, যেমন আনমনা মন, মনে পড়ছে না, মনে ভেবে দেখি, ভোলা মন, মন খুব ভাল, মনে দুঃখ কষ্ট ইত্যাদি ইত্যাদি। এই মন নিয়ে অনেক গবেষণা চলছে কিন্তু এর অবস্থান, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাদি তথা গতি প্রকৃতি কিরূপ তা নিয়ে সম্যক ধারণা কি বোঝাপড়া এখনো হয়নি।

সৃষ্টির শুরু থেকে আজও পর্যন্ত সমানভাবে ইহলোকের সাথে পরলোকের যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে অদৃশ্যের অন্তরালে আমাদের প্রতিটি মানবদেহের অভ্যন্তরে থাকা 'মন' নামক এই বস্তুটি। এ জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে বাঁধা, সেতুবন্ধন রক্ষাকারী। সেই কারণে মরলোক থেকে অমরলোক এর যাতায়াত সর্বত্রই, অবাধ গতি—এর জ্বর জরা ব্যাধি বার্ধক্য এমনকি নিদ্রাও নেই, সর্বদা জাগরিত। মনের যেহেতু ভোগ নেই সেই হেতু বাড়া বা কমাও নেই। মৃত্যু হয় দেহের কিন্তু মনের হয় না, মনের মৃত্যু নেই, —মন এমন এক জিনিস যারে টাকা পয়সার দ্বারা কেনা যায় না, সোনাদানার বিনিময়ে পাওয়া যায় না, চোর চুরি করে নিতে পারে না, স্বেচ্ছায় না দিলে জোর করে পাওয়া যায় না।

প্রতিটি মানব মনে ঈশ্বরের ছোঁয়াচ ও স্পর্শ বর্তমান। সেই কারণে মনকে জয় তথা কব্জা করতে পারলেই চাওয়া পাওয়া সব হয়ে গেল। লোভ লালসা বাসনা আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ সবই নিজের Control-এ, নিজের হাতের মুঠোয়। চোর চুরি করতে গিয়ে গৃহস্থের বাড়ীর ভেতরে ঢোকা পর্যন্ত চিন্তা, কিন্তু গৃহস্থ নিজেই যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে চাবিকাঠি দিয়ে দেয় তাহলে আর দেখে কে? যেটা খুশি নিয়ে যাও না কেন? কেহই বাধা দেবে না। কিন্তু এখানেই ব্যতিক্রম, চোর গৃহস্থের মহানুভবতার সংস্পর্শে এসে নিজেও মহৎ হতে চায়। তেমনি কোন মানুষ মন-এর কর্তৃত্ব নিজের হাতে পেয়ে গেলে সব চাওয়া পাওয়া শেষ, জীব এখন জীবাত্মায় পৌঁছে গেল। জীব নিজেই এখন শিব, জাগতিক চাওয়া-পাওয়ার ঊর্ধ্বে।

হারিকেন থেকে আমরা আলো পাই, কিন্তু ঝুল পড়তে থাকলে ক্রমশঃ আলো কমতে থাকে অবশেষে একদিন আলো থেকেও আর দেখা যায় না। মনও তাই, একটা জ্যোতির্ময় জিনিস যা আলো দেখাচ্ছে, কিন্তু হারিকেনে ঝুলে ঢেকে দেওয়ার ন্যায় দেহ কামনা বাসনা চাওয়া পাওয়ায় ডুবে থাকার যে মলিনতা তা আবছা করে দিচ্ছে, মনকে প্রকাশ হতে দিচ্ছে না। ফলে আমরা ঈশ্বরের Touch-এ থেকেও তাকে দেখতে পাচ্ছি না, তা থেকে চির বঞ্চিত।

মন মানবদেহের দর্পণ স্বরূপ, অবস্থান মাথার পিছনের টিকির নীচে, তার প্রতিবিম্ব পড়ে মাথার সম্মুখভাগে ভ্রূ-দ্বয়ের মাঝখানে তৃতীয় চোখে, —যার অপর নাম মনশ্চক্ষু।

প্রকৃতির যাবতীয় ঘটনাবলী ও কাজ কারবার ঐ মনশ্চক্ষুতে ধরা পড়ে। অবিকল টিভির এর পর্দায় ভেসে ওঠা ছবির ন্যায়। কিন্তু ঈশ্বরের কাজকর্ম সবেতেই কেবল প্রকাশ, কোনও ভাষা বা বাক্ অর্থাৎ কথা নেই। মনের প্রকৃত বোঝাপড়া ওখানেই ঐ প্রকাশ দেখেই।

ঐ বোঝাপড়াতে যদি ভুল থেকে যায় সাধুদের ব্যাখ্যাতেও ভুল থেকে যায়। মনকে যে জেনেছে, তার স্বরূপ যে ধরতে পেরেছে তার আর ভাবনা কোথায়? সে নিজেই প্রকৃতির Magnet হয়ে গেছে। এখন কেবল বুঝে সুঝে চলা আর কাজ করা। নদী সাগরে পৌঁছে গেলে সব মিলে মিশে এক হয়ে একাকার, মহাসাগরে পৌঁছাতে আর বেশী সময় লাগে কি? একই ভাবে জীব মনকে একবার Control করতে বা স্থির করতে পারলে জীব থেকে জীবাত্মায় পৌঁছে গেল, পরমাত্মায় পৌঁছাতে আর কতক্ষণ?

মনের কাজ

জীবের সাথে জীবাত্মার সমন্বয় বা যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে মানবশরীরের মন নামক বস্তুটি, অপরদিকে এই মন ইহলোকের সাথে পরলোকেরও যোগাযোগ সাধিত করে থাকে।

মনের কাজ আয়নার কাজের সাথে তুলনীয়। পরিষ্কার আয়নাতে যেমন সমস্ত কিছুর প্রতিবিম্ব দেখা যায় অনুরূপভাবে স্বচ্ছ মনে কোন্‌টা ভাল এবং কোন্‌টা মন্দ তার সবটাই ধরে পড়ে। আমরা যখনি কোনও নতুন কাজ করি আত্মারূপী মন তখনি তা ঠিক অথবা ভুল, করা উচিত বা অনুচিত প্রথম প্রথম জানাতে থাকে, কিন্তু ঝাঁপ পড়া আয়নাতে যেমন কিছুই দেখা যায় না, তেমনি মন থেকে পাঠানো বার্তা বা নির্দেশ বার বার উপেক্ষা অবহেলা অবজ্ঞা অথবা তাচ্ছিল্য করার কারণে মনের কোণে ময়লা ও মলিনতা দেখা দেয় তখন সঠিক বেঠিক হুঁশ থাকে না।

প্রথম দিন কোথাও চুরি বা ডাকাতি করতে গেলে অথবা অনুরূপ কোনও কু-কাজে আমাদের মনে ভয় জাগে, এই হল মনের সতর্কীকরণ। কিন্তু মনের ঐ ইঙ্গিত উপেক্ষা করে আবার চুরি বা অনুরূপ কোনও গর্হিত কাজ করতে গেলে ক্রমান্বয়ে ভয় কমতে থাকে, অবশেষে একদিন সমস্ত ভয় দূর

হয়, অর্থাৎ মন আর কোনও সতর্ক বার্তা পাঠায় না। তখন মনের আয়নাতে পুরোপুরি ঝাঁপ পড়ে যায়। এরূপ অবস্থায় মন হাল ছেড়ে দেয়। অপরদিকে মনের ঐ সতর্কবার্তা বা ইঙ্গিত ইশারা তাচ্ছিল্য বা অগ্রাহ্যকারী দিনের পর দিন ক্ষতির দিকে ধাবিত হতে থাকে, যার পরিধি বা গভীরতানুযায়ী এক জন্ম ছাড়িয়ে পরের জন্ম পর্যন্ত চলে যেতে পারে।

মানুষ মারা যাওয়ার পর দেহ থাকে না, কিন্তু মন থেকে যায়। স্বাভাবিকভাবেই মনের খাতায় ধরা থাকা সমস্ত 'কু' অথবা 'সু' কর্মের ছাপ ধরা থেকে যায়। নতুন দেহ পাবার সাথে সাথে ঐ কর্মের প্রভাব (গুরুত্ব অনুযায়ী) পুনরায় ফুটে ওঠে।

মন স্থির করার উপায়

আমাদের দৈনন্দিন তথা প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী বা ঘাত প্রতিঘাতের দ্বারা মন অস্থির হয়ে পড়ে। সেই কারণে মনকে আমরা অতি চঞ্চল বলে থাকি, একে বশে আনতে পারি না। গীতাতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকেও ঐ একই কথাই বলেছেন। আরোও বলেছেন, ঐ অস্থির মনকে অভ্যাসের দ্বারা স্থির করতে। সত্যি কথা এই যে, কঠিন অভ্যাসের দ্বারা মনরূপ জিনিসটিকে বশে আনা সম্ভব, যেহেতু কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য হিসেবে মন স্থির। গাছ যেমন নিজে স্থির, চলন গমন নেই কিন্তু হাওয়া ঝড়ে অস্থির হয়ে যায় মনও তাই নিজে স্থির বহুমুখী ঘটনা কি ঘাত- প্রতিঘাতে অস্থির হয়ে পড়ে, ছুটে বেড়ানোর অবাধ গতি পেয়ে যায়।

গন্ধ বহন করে ফুলের যেমন সন্ধান দিতে পারে একমাত্র বাতাস তেমনি মানব মনের সন্ধান দিতে পারে একমাত্র মানব দেহাভ্যন্তরে অবস্থিত প্রাণ নামক বস্তুটি। মন প্রাণের উপর ভাসমান, প্রাণ তরল এবং প্রাণবায়ুর উপর ধরা, কাজেই এই প্রাণবায়ু তথা শ্বাস-প্রশ্বাসকে Control-এতে আনতে পারলে মনও আপনা-আপনি স্থির হয়ে যায়। অত্যাধিক কাজকর্ম ছোটা-দৌড়ায় শ্বাস প্রশ্বাসের গতি খুবই দ্রুত হয়, ফলে মনকে স্থির করা সম্ভব হয় না। অপরদিকে শোওয়া, বসা; নিদ্রা, অলসতা বা ক্লান্তিতে আমাদের ঘুমও এসে যায়। এই উভয় কারণে মনকে স্থির করা যায় না।

যেহেতু আমাদের মানবশরীরের নার্ভসমূহ শরীরের পিছনে সেই কারণে মনকে স্থির করার জন্য মেরুদণ্ড সোজা রেখে স্থির হয়ে বসতে হয়। নির্জন নীরব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গায় ও আসনে নিয়মিত ভাবে বসা খুবই দরকারি।

এর পর শ্বাস প্রশ্বাসের গতি অতি ধীরে ধীরে চালনা করতে হয়। যৌগিক পরিভাষায় এরই নাম প্রাণায়াম। দীর্ঘ প্রচেষ্টা অধ্যবসায় নিষ্ঠা এবং ঐকান্তিক ব্যাকুলতায় একদিন সফলতা মেলে। এইভাবে প্রাণবায়ুকে স্থির করে মনকে স্থির করা যায়। এখনই হওয়া যায় মনের রাজা, Electric Current-এর ন্যায় মনকে কব্জা করে তখন যে কোনও কাজে লাগানো যায়। সব থেকে মজার ব্যাপার এই মনের রাজা হতে পারলে তখন আর এটা-ওটা কোনও কু-কাজে মন যেতে চায় না। অমরত্ব বা অমৃতের সন্ধান পেয়ে গেলে কেহ আর বিষবৎ জড় জগৎ নিয়ে মেতে থাকতে চায় কি?

মনকে স্থির করার দ্বিতীয় উপায়টি হল পূর্ব বর্ণিত ঐ একইভাবে স্থির হয়ে চোখ দু'টি বন্ধ অবস্থায় যে কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনার উপর মনকে নিবিষ্ট রাখতে চেষ্টা করা। প্রথম প্রথম যেমন একই ভাবে অনেকক্ষণ স্থির হয়ে বসা কষ্টকর, তেমনি মন থেকে নানা এলোমেলো চিন্তার জট ছাড়ানো আরো কষ্টকর। তবে চেষ্টায় কি না হয়? প্রাত্যহিক রুটিন ধরে এগোতে থাকলে ফল অবশ্যম্ভাবী, একদিন না একদিন ফল মিলবেই।

তবে এ'কথাটিও ঠিক আমাদের শ্বাসবায়ু যত তাড়াতাড়ি স্থির হতে থাকে মনও তত তাড়াতাড়ি ধীর স্থির হয়ে যায়।

মেরু

যার দ্বারা কোনও কাঠামো ধরা থাকে তা মেরু নামে চিহ্নিত। দণ্ড বা লাঠি রূপ মেরুদণ্ডের দ্বারা আমাদের দেহ কাঠামোটিও ধরা। অনুরূপভাবে পৃথিবীর উত্তর প্রান্তে উত্তর মেরু বা সুমেরু এবং দক্ষিণ প্রান্তে দক্ষিণ মেরু বা কুমেরু। এই দুই প্রান্তে দুই মেরুর সহযোগে পৃথিবীর কাঠামোটি ধরা। কুমেরু অঞ্চলের Magnetic ক্ষমতা খুব বেশী, যার জন্য পৃথিবীর দক্ষিণ দিক থেকে মহাকাশে কোনও যন্ত্রপাতি পাঠানো সহজে সম্ভব হবে না। আমাদের বেঁচে থাকার সব কিছু পৃথিবীর দক্ষিণ দিকে এবং বোঝাপড়ার সমস্ত কিছু উত্তর দিকে।

পৃথিবীর অনুরূপ ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যবর্তী মেরুদণ্ডের সঙ্গে সংলগ্ন সুষুম্না নামক নাড়ি বিশেষ দ্বারা আমাদের মানবদেহ কাঠামোটিও ধরা। এর এক প্রান্তে মলদ্বার (মূলাধার) এবং অপর প্রান্ত মস্তিষ্কে টিকি (সহস্রা), যা মানবশরীরের যথাক্রমে দক্ষিণ মেরু ও উত্তর মেরুর অনুরূপ কাজ করে চলেছে। মানবশরীরের পা দুটি দেহকাঠামোটিকে ধরে রেখেছে মাত্র।

মলদ্বারের অপর নাম গুহ্যদ্বার, যেহেতু এইই হল সৃষ্টির গুহ্য রহস্য ভেদ করার দ্বার বা প্রবেশ পথ। এখান থেকেই যৌগিক প্রক্রিয়ায় সাধন ভজনের কাজ শুরু করতে হয়। পৃথিবীর অনুরূপ আমাদের মানব শরীরের বেঁচে থাকার যাবতীয় সহায় সম্পদ নীচের দিকে পেটে এবং বোঝাপড়ার সমস্ত কিছু উপরের দিকে মাথায় বা Brain-এ।

মৃত্যু

মৃত্যু অর্থে দেহের অবস্থার পরিবর্তন বা প্রকারভেদ—স্থূল অবস্থা থেকে সূক্ষ্ম অবস্থা। জীবের জন্ম মৃত্যু চক্র—জীব থেকে জীবাত্মা আবার জীবাত্মা থেকে জীবে ফিরে আসা, সৃষ্টির শুরু থেকে এই নিয়ম আজও অটুট, আজও অক্ষত, তবে সবকিছুর মূলে পরমাত্মা পরম শক্তি।

জন্ম থাকলে মৃত্যু থাকবেই, মৃত্যুতেই জীবনের সব শেষ বা চরম পরিণতি মোটেই তা নয়। কাজেই জন্ম থাকলে যেমন মৃত্যু থাকবে তেমনি মৃত্যু থাকলে পুনরায় জন্মও থাকবে। পৃথিবীর জল মাটি ও বাতাস নিয়েই আমাদের আসা যাওয়া, এদের যদি শেষ না থাকে প্রাণীকুলেরও অস্তিত্বের শেষ হবে না, ধ্বংস হয়ে গেলেও পুনরায় ফিরে আসবে। সৃষ্টির নিয়মে এও ঘূর্ণায়মান চাকার ন্যায় অনবরত এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থার মধ্য দিয়ে পুনরায় পূর্বের অবস্থায় যাওয়া আসা করছে। বুদ্ধদেব তার জাতকের গল্পে অথবা শ্রীকৃষ্ণও তার গীতায় এই কথাই বলে গেছেন।

"আছে জন্ম আছে মৃত্যু বিরহ যাতনা বাজে"।

জন্ম থাকলে যেমন দেহ থাকবে, তেমনি দেহ থাকলে এর কাঠামোগত গুণে মৃত্যুও থাকবে। এই জন্ম-মৃত্যুর বেড়াজাল তথা মায়ার বন্ধন কাটিয়ে উঠতে না পারলে জীবের দুঃখ কষ্ট ব্যথা বেদনার হাত থেকে রেহাই বা নিষ্কৃতি পাবার কোনও পথ নাই। দেহ থাকবে অথচ দেহের কাঠামোগত প্রাকৃতিক ষড় রিপুর গুণ সমূহ থাকবে না—এ জিনিস বাস্তবে হতে পারে না। সুতরাং দেহ থাকলে চাওয়া পাওয়া থাকবে, আর চাওয়া পাওয়া থাকলেই দুঃখ কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণা থাকবে। এই চাওয়া পাওয়া মায়া মোহ মমতা কাটিয়ে ওঠার নামই হল মোক্ষলাভ, অর্থাৎ মুক্তি পাওয়া—জন্ম মৃত্যুর দুঃখ কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া, যা সাধারণের চিন্তার অতীত। কোটি কোটি মুনি ঋষি সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে সামান্য মাত্র হাতে গোনা দু/একজন এই মোক্ষলাভে সমর্থ হয়েছেন—পেয়েছেন জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন ও বেড়াজাল থেকে চিরতরে মুক্তি ও অব্যাহতি।

আমাদের সর্ব সাধারণের কাজ ন্যায়নীতি সত্য অসত্যকে মাথায় রেখে নিজ নিজ কর্তব্য কর্মে ব্রতী হওয়া। এরূপ ভাবে এগোতে থাকলে আমরা জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ থেকেও সাংসারিক ও সামাজিক দুঃখ কষ্ট থেকে ক্রমশঃ রেহাই পেতে পারব, অতি ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকব চির মুক্তির পথে।

মানুষ পারে না, মানুষের তৈরি যন্ত্র পারে — কারণ কি?

মানুষ যন্ত্রের নির্মাতা, রূপকার ও উদ্ভাবক, কিন্তু মানুষ নিজে যা পারে না তার হাতে তৈরি যন্ত্র তা পারে—এই অতি বাস্তব কথাটি দেশ বিদেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত সবাই একবাক্যে স্বীকার করে থাকেন। কিন্তু এর পিছনে কি মায়া রহস্য লুকিয়ে রয়েছে তা আমাদের সবাইকার অজানা।

সৃষ্টির রহস্য ভেদে এর উত্তর পাওয়া যায়। তখনি জানা যায় পৃথিবীর বুকে যে সমস্ত ধাতু অধাতু পাওয়া যায় তা খোদ বিশ্বপ্রকৃতির বা সূক্ষ্ম প্রকৃতির শক্তিতে সৃষ্ট। ঐ শক্তির ফলে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ অহরহ ফুটছে এবং ওখানকার চাপ ও তাপের ফলে বিভিন্ন ধাতব পদার্থ সমূহের উদ্ভব ঘটছে।

অপরদিকে মনুষ্য তথা জীবকুল সৃষ্টির মূলে আছে স্থূল প্রকৃতি, যার প্রকাশ বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষমতা বলেই, কাজেই সূক্ষ্ম প্রকৃতির ক্ষমতা স্থূল প্রকৃতির থেকে অনেক বেশী। এই কারণে মানুষের তৈরি যন্ত্র যা পারে মানুষ নিজে কারিগর হয়েও তা পারে না।

এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটি কথা অতি অবশ্যই বলে রাখতেই হয়, যেটি হল মানুষ নিজে প্রকৃতির হাতে গড়া যন্ত্র, যে যন্ত্রের কাজ প্রকৃতির সম্পদ সমূহকে জনজীবনে ঠিক ঠিক কাজে লাগানো এবং প্রকৃতির সৌন্দর্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা, সৃষ্টিকর্তার জয়গান করা।

মা - কে?

আমরা নারীমাত্র প্রত্যেককেই মাতৃ সম্বোধনে সম্ভাষিত করে থাকি। কিন্তু প্রকৃত মা হচ্ছেন তিনি যিনি গর্ভে সন্তান ধারণ করেছেন। এই কারণেই আমাদের প্রতিটি মা নিজ সন্তানের মুখ থেকে 'মা' নামের ডাক শুনে সব থেকে বেশী তৃপ্তি পান।

পৃথিবীর মাটি নামক বস্তুটি সমস্ত জীবকুলের কাছে 'মা' রূপে পরিগণিত। কারণ, সমগ্র জীবকুলের দৌড় ঝাঁপ, জীবন জীবিকা হাসিখুশি বাঁচা মরা সমস্ত কিছু সর্বংসহা মাটির উপর ঘটে থাকে।

সৃষ্টিতে পুরুষ এবং প্রকৃতি এই দুইয়ের মধ্যে প্রকৃতি-ই মা হিসেবে চিহ্নিত, যেহেতু সৃষ্টির নিয়মকানুনের সমস্ত কিছুই তার মধ্যে ধরা। প্রকৃতি রূপ এই মায়ের দুই রূপ—সূক্ষ্ম এবং স্থূল। আমাদের জীবকুলের জন্ম-বৃদ্ধি-মৃত্যু চক্রের সমস্ত কিছু প্রকৃতির স্থূলরূপের মধ্যেই আছে ধরা।

মানুষের পক্ষে যন্ত্রপাতি ছাড়া যেখানে সেখানে যাওয়া কি সম্ভব?

এর প্রথম উত্তর না, দ্বিতীয় উত্তর হ্যাঁ। মানবদেহ স্থূল শরীর। যন্ত্রপাতি ছাড়া কোনও স্থূল দেহধারীর পক্ষে পৃথিবীর যত্রতত্র মুহূর্তের মধ্যে যাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু সূক্ষ্ম দেহধারীর পক্ষে সম্ভব। বাবাজী মহারাজ, যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী এবং সাধক তৈলঙ্গস্বামী—এদের জীবনে এমনটি ঘটেছিল। এরা প্রত্যেকেই যৌগিক সাধন ভজনে পাকাপোক্ত। একমাত্র প্রাণায়াম সিদ্ধ পুরুষদের পক্ষেই প্রয়োজনে স্থূলদেহ থেকে সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে এখানে ওখানে বিচরণ করা এবং পরবর্তীকালে পুনরায় স্থূলদেহে ফিরে আসা সম্ভবপর, অন্যদের পক্ষে তা নয়।

অর্জুনকে যোগীদের সাথে তুলনা করা যেতে পারে কি?

অর্জুনকে যোগীদের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। অর্জুন কথাটি অর্জন শব্দ থেকে এসেছে। যোগীরা যে রূপ কঠোর সাধন ভজনের দ্বারা বিশেষ বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেন, পৌঁছে যান মূল লক্ষ্য ঈশ্বর সমীপে—অর্জুনও তাই। অর্জুন তার একাগ্রতা ভক্তি আত্মবিশ্বাস উৎসাহ এবং নিষ্ঠাদির দ্বারা ব্যতিক্রম ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন, ফলে পৌঁছে গিয়েছিলেন মূল লক্ষ্যে পরিগণিত হয়েছিলেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদ হিসাবে, এই হিসাবে অর্জুনও যোগী।

দ্বিতীয়তঃ যৌগিক সাধন পথে যাওয়ার জন্য যেরূপ শক্ত সবল শারীরিক কাঠামো হওয়ার প্রয়োজন তা একমাত্র অর্জুনের মধ্যেই ছিল। যুধিষ্ঠির বা পঞ্চপাণ্ডবের অন্য কোনও ভাইয়ের মধ্যে ঐ জিনিস ছিল না। এই কারণে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যোগী হতে বলেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন অর্জুনের দেহের মধ্যে যে বিষেশ ক্ষমতা বর্তমান তা যৌগিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় সাধনপথে যাওয়ার পক্ষে বিশেষ সহায়ক ও অনুকূল।

রামায়ণ মহাভারতের যুদ্ধ বাস্তবে ঘটেছিল কি?

রামায়ণ ও মহাভারতের মতো যুদ্ধ বিগ্রহ মোটেই সাজানো বা কল্পিত নয়, বাস্তবে এ'গুলো ভারতের বুকে কয়েক হাজার বছর আগে ঘটেছিল।

জনমনে এগুলি আকৃষ্ট বা গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য এর সাথে নতুন কিছু তথ্য বা ঘটনা জুড়ে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে মাত্র।

রামায়ণ ও মহাভারতের যুদ্ধ ভারতের বুকে একদিন যা বাস্তবে ঘটেছিল মহাশূন্যে পরিব্যাপ্ত ইথার তরঙ্গে এখানে তা ধরা আছে। যৌগিক সাধন ক্রিয়া অবলম্বনে ষট্‌চক্রভেদে ঐ দৃশ্যসমূহ এখনোও মনশ্চক্ষুতে ধরা পড়ে।

কেবলমাত্র রামায়ণ বা মহাভারতের যুদ্ধবিগ্রহ নয়, পৃথিবীর বুকে যে সমস্ত বৃহৎ ও স্মরণীয় ঘটনাসমূহ একদিন ঘটে গেছে তা সাধন ভজন প্রণালীতে ষট্‌চক্রভেদে এক এক করে TV-এর পর্দায় ভেসে ওঠার ন্যায় সাধকের তৃতীয় চোখ তথা জ্ঞানচক্ষুতে ভেসে ওঠে। ওখান থেকেই সাধকের পক্ষে বলে দেওয়া সম্ভব হয়।

রাশির কাজ

রাশি কাজ করে গ্রহের সমন্বয়ে। ১২টি রাশি নির্ভর করে সূর্যের আবর্তনের উপর, চন্দ্রের উপর নির্ভর করে মাস। পৃথিবীর উৎস যোনীমুখ এই বাঙলার ছয় ঋতু। পৃথিবীতে ১২ মাস, সূর্যের কাছে ১২ পাক সময়ের সমান।

আমাদের শরীরের মধ্যস্থিত কাম ক্রোধ লোভ মদ মোহ ও মাৎসর্য এই ৬টি রিপু। ৯টি গ্রহ এবং ১২টি রাশির প্রভাবে আমাদের শরীরে যাবতীয় রোগ ব্যাধি, আচার-আচরণ ও স্বভাবের তারতম্য ও হেরফের ঘটে থাকে। সমস্ত কিছু যোগান থেকেও সংসারে অশান্তির বড় কারণ স্বামী ও স্ত্রীর রাশির তারতম্য হেতু মনের মিলে তফাৎ।

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০০৭ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এক অতি চমকপ্রদ খবর, যেখানে বলা হয়েছে এক বিজ্ঞানী পিটার অস্টিনের মুখ থেকে রাশি ও রোগের অভিনব সমীকরণের কথা, যা জানতে পেরে সম্মেলনে হাজির বাকি বিজ্ঞানীদের চক্ষু হয়েছে ছানাবড়া।

খবরটি হল—

মানুষের উপর গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব যখন বিজ্ঞানীরা ফুৎকারে উড়িয়ে দিচ্ছেন তখন সানফ্রান্সিসকোয় আমেরিকান এ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অফ সায়েন্সের বার্ষিক সম্মেলনে কানাডার এক বিজ্ঞানী টরেন্টোর 'ইনস্টিটিউট ফর ক্লিনিকাল ইভ্যালুয়েটিভ সায়েন্সস''—এর গবেষক পিটার অস্টিন তার গবেষণালব্ধ ফল থেকে জানিয়েছেন ১২টি রাশি (ইংরেজি হিসাব অনুযায়ী), প্রত্যেকটির সঙ্গেই মানুষের কোন না কোনও অসুখের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে।

অস্টিন নিজেই স্বীকার করেছেন, রাশির প্রভাবে মানুষের শারীরিক রোগের সম্পর্ক সম্বন্ধীয় , যদিও কোনও বৈজ্ঞানিক সূত্র তিনি অদ্যাপি দিতে পারেননি তথাপি তিনি দীর্ঘ সাত বছর ধরে অন্টারিওর দশ কোটি বাসিন্দার উপর সমীক্ষা চালিয়ে এই বিস্ময়কর ফল পেয়েছেন।

শিক্ষার দরকার কেন?

শিক্ষার মূল্য যে অপরিসীম তা আজ আমাদের কারো জানতে বাকি নেই, সবাইকার জানা হয়ে গেছে। শিক্ষার দ্বারা মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ ঘটে। শিক্ষার দ্বারা আচরণ তৈরি হয়, স্বভাবের পরিবর্তন ঘটে। শিক্ষার দ্বারা চরিত্রের উন্নতি ঘটে থাকে, নৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পায়, চিত্ত শুদ্ধি হয়।

পুঁথিগত বা প্রথাগত শিক্ষার দ্বারা যে জ্ঞান অর্জন হয় এর নাম চলিত জ্ঞান। প্রকৃত জ্ঞান বা প্রকৃতিজ জ্ঞান প্রথাগত বা পুঁথিগত শিক্ষায় হয় না। নিজে জেনে ও নিজেকে বিচার বিশ্লেষণ করে যে শিক্ষা হবে সেটাই আসল শিক্ষা, এই জন্য আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রয়োজন হয় বেশী করে।

আমাদের শিক্ষা লাভ করার আরো দরকার—অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোকে আসার জন্য। অতীতের ভুল সমূহ শোধরে নিয়ে আরো উন্নততর জীবন যাপনের জন্য। ভ্রান্ত ধারণাসমূহ দূরে সরিয়ে অবচেতন থেকে চেতনায় আসার জন্য। স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয়ের মধ্যে প্রভেদ টানার জন্য। সর্বোপরি মনুষ্য জীবনের আসল উদ্দেশ্য আমরা কোথা থেকে এলাম? কেন এলাম? কীভাবে এলাম? এ-সবের পিছনে কে বা কারা? —এ'সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাবার জন্য।

অশিক্ষিত হওয়ার কি জ্বালা তা পাঁচজন শিক্ষিতের সংস্রবে থাকলেই সব থেকে ভালভাবে জানা যায়।

শক্তি

বিশ্ব চরাচরের সমস্ত কিছু সৃষ্টির মূলে আছে এক অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শক্তি, যেখানে ঈশ্বর হলেন সর্ব শক্তির আধার ও সর্বময় কর্তা।

পৃথিবী ও সূর্য উভয়েই বিশ্বপ্রকৃতির একই শক্তিতে সৃষ্ট। পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগই হল পৃথিবীর সম্পদ সৃষ্টির উৎসস্থল। অপরদিকে জীবকুল সৃষ্টির উৎসস্থল হল মহাশূন্য মহাকাশ, যার পরিচালনার মূলে আছে সূর্য।

শক্তি স্থায়ী, সৃষ্টির আদি থেকে একই আছে, কিন্তু শক্তি থেকে সৃষ্ট যা কিছু তার সবটাই অস্থায়ী। শক্তি থেকে পদার্থের সৃষ্টি, শক্তি খালি চোখে

দেখা যায় না, বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যেই ধরা পড়ে, অপরদিকে পদার্থ খালি চোখে দেখা যায়।

আমরা সমগ্র জীবকুল যে শক্তিতে সৃষ্ট ও পরিচালিত সেটা কিন্তু ঈশ্বর নয়। প্রকৃতির সৃষ্টি ঈশ্বর থেকে, এই প্রকৃতির শক্তি থেকেই জীবের সৃষ্টি। পৃথিবীর বুকে যখন যেরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তখন অনুরূপ জিনিসটি ফুটে ওঠে, সৃষ্টির কৌশল এ'ভাবেই তৈরি।

শক্তির মোট স্তর ১৪টি। এর মধ্যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ধরা আছে ৭টি এবং সৌরলোকে ৭টি। মানুষের সব ক'টি ইন্দ্রিয়কে বিশেষ কৌশলে কাজে লাগিয়ে শক্তির প্রথম ৭টি স্তর ভেদ করে হয় ঈশ্বর দর্শন এবং পরবর্তী ৭টি স্তর ভেদে হয় সৃষ্টির গুহ্য রহস্য ভেদ করা।

ষড়চক্রভেদে মানুষের কূটস্থে যখন ঐ শক্তির স্বরূপ ধরা পড়ে তখন জ্বলন্ত আগুনের লেলিহান শিখার ন্যায় প্রথমে লাল দেখায়, পরে শুভ্র বর্ণ, ওতেই সমস্ত কিছু ভাসতে থাকে, সে অনবরত ফুটছে, এর মধ্যেই নতুন নতুন জিনিস ফুটে ওঠে। এইভাবেই পৃথিবীর সৃষ্টি।

শক্তি কারোও করায়ত্ব নয়, কারো কাছে বাধা পড়ে না, আছে বিভিন্নতা, আছে প্রকারভেদ। তবে কেহ রপ্ত বা অর্জন করতে চাইলে বাদ সাধে না, শিষ্য গুরুকে কাতর হয়ে ডাকলে ঐ শক্তিই তা ধরিয়ে দেয়। একলব্য এইভাবেই কুরু পাণ্ডবের অস্ত্র গুরু দ্রোণাচার্যে সহযোগিতা ছাড়াই ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী হয়েছিলেন। প্রাকৃতিক শক্তির নিয়মেই শিক্ষক বা গুরুর অনেক না জানা তথ্য যথাক্রমে ছাত্র বা শিষ্যের করায়ত্ব হয়ে যায়। ঐ একই শক্তিতে পুত্র পিতাকেও শিক্ষা-দীক্ষা, যশ-মান-খ্যাতিতে ডিঙিয়ে যেতে পারে।

শক্তির এমনি Capacity কোনও মানুষ ভুল পথে চললে তার মনের পর্দায় তা ধরিয়ে দেয়, করে দেয় সাবধান ও বারংবার সতর্কীকরণ— মানব মনে ভয় জাগে। কিন্তু ঐ সাবধান ও সতর্কতা বারবার উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করলে মানুষ ক্ষতিতে পড়ে যায়—মানুষ আর মানুষ থাকে না।

শক্তির স্বরূপ জালিভাব। কাটা গাছের কাণ্ডে যেমন জালিভাব দেখা যায়, শক্তিও তাই। মানবদেহে লোমকূপে ছিদ্রের ন্যায় অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম Gap আছে। সেই কারণে চাপ সৃষ্টি করে ঘনত্ব বাড়ানো যায়। সাধু মুনি ঋষিরা এইভাবেই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ঈশ্বর সাধন ভজনে সফলতা লাভ করেন।

আমরা প্রাকৃতিক শক্তিকে বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে কাজে লাগিয়েছি। আমরা একের পর এক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে দ্রুত এগিয়ে যেতে

সক্ষম হয়েছি। কিন্তু সব থেকে মজার কথা মূল যে শক্তি যার দ্বারা বিশ্বচরাচরে সমস্ত কিছুই সুকৌশলে নিয়ন্ত্রিত, যা সমস্ত শক্তির আধার তাকে এখনো কোনও যন্ত্রে ধরা যাচ্ছে না। এই অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অথচ বিরাট তেজোময় এক এবং অদ্বিতীয় শক্তি, যারে সাধকগণ ঈশ্বর নামে চিহ্নিত করেছেন তাকে একমাত্র মানবদেহ যন্ত্রেই ধরা সম্ভব, অন্য কোনভাবেই ধরা সম্ভব নয়। ঐ শক্তিকে ধরার পথ কেবলমাত্র একটিই— প্রাণকে মেরে মনের সাধনা, দ্বিতীয় কোনই পথ নেই।

মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব কেন?

সমস্ত জীবকুলের মধ্যে একমাত্র মানুষই সবার শেষে এসেছে। তবুও সে পেয়েছে শ্রেষ্ঠত্বের আসন কারণ তার বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা, তার বুদ্ধিবৃত্তি তার দূরদৃষ্টি ক্ষমতা। মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগিয়ে কেবলমাত্র উন্নততর জীবন যাপন কি নতুন নতুন আবিষ্কার অথবা উদ্ভাবন নয়, পরন্তু নিজের প্রজন্মকে গড়ে দিয়ে উন্নততর করে তুলতে পেরেছে। কিন্তু বাঘ, হাতি, সিংহ প্রভৃতির দেহে প্রবল শক্তি অথবা পাখিদের আকাশে উড়ে যাওয়ার প্রচুর ক্ষমতা থাকলেও এটা পারেনি। সৃষ্টির শুরু থেকে আজও অবধি তারা একই অবস্থায় একই অন্ধকারে থেকে গেছে।

কোন কোন প্রাণীর মধ্যে সামান্য কিছু বুদ্ধিবৃত্তির লক্ষণ দেখা যায়—এ কথা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু তা কেবলমাত্র তাদের আত্মরক্ষা তথা সুষ্ঠুভাবে জীবন ধারণের জন্য। কিন্তু মানুষের যে ব্যতিক্রম গুণটি আছে সেটি হল বিশ্বচরাচর নিয়ন্ত্রণের মূলে থাকা সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম হওয়া। এখানেই তার শ্রেষ্ঠত্ব। এই শ্রেষ্ঠত্বকেই কাজে লাগিয়ে সে জানতে পারে নিজেকে, জানতে পারে নিজের জন্ম মৃত্যুকে, জানতে পারে মৃত্যুর পরের জগৎ ছাড়িয়ে অমরলোকের অন্যান্য সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ কৌশলকে। এইখানেই তার শ্রেষ্ঠত্ব, এই কারণেই সে বিশ্বলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে পরিগণিত।

ষট্‌চক্রভেদে ঈশ্বর দর্শন

বিভিন্ন পথে ও মতে ঈশ্বর দর্শন সম্ভব, এগুলির মধ্যে যৌগিক ক্রিয়া পদ্ধতি বা যোগমার্গের পথে যাওয়া সব থেকে কষ্টদায়ক। সেই কারণে প্রাপ্তির পরিমাণ ও আনন্দ সব থেকে বেশী।

ঈশ্বর সাধনায় যৌগিক ক্রিয়া পদ্ধতিতে এক এক করে ছয়টি স্তর বা গ্রন্থি অতিক্রম করে ষট্‌চক্রভেদে হয় ঈশ্বর দর্শন।

ষট্‌চক্র ভেদের অবস্থাগুলি —

(অবস্থা ভেদে কিছু ইতর বিশেষ হয়ে থাকতে পারে)

(১) নং- নাম মূলাধার। মানব শরীর কাঠামো ধরে রাখার মূলে থাকা মেরুদণ্ডের মধ্যস্থিত প্রধান নাড়ি সুষুম্না (Spinal cord) এবং কুণ্ডলিনী শক্তির আধার মূলাধার (মূল + আধার)—এই নাম। মূলাধার হল তন্ত্র এবং যোগ সাধনার প্রবেশ পথ। আমাদের মলদ্বার হল মুলাধার বা গুহ্যদ্বারের স্থান, এখান থেকেই গুহ্য তত্ত্ব জানার কাজ শুরু করতে হয়।

মূলাধার বা কুণ্ডলিনী জাগরিত হওয়ার অর্থ সাধকের জীবনস্রোত অন্যদিকে প্রবাহিত হতে শুরু হওয়া। এখানে সাধকের মধ্যে ভয়-ভীতি, অস্থিরতার ভাব পরিলক্ষিত হয়। এই অবস্থা আরও ভীতিদায়ক হয়ে ওঠে যখন ঐ পথের পথিক বা সমপর্যায়ের কাউকে কাছে পিঠে পাওয়া যায় না।

এই অবস্থায় সাধকের মধ্যে হতাশা ভাব বাড়তে থাকে, শরীরের মধ্যে এ'রূপ কি হল কেন হল, এ সব করে কি হবে?—এরূপ ভাব। একা একা থাকতে চাওয়া, কারো সাথে কথাবার্তা বলতে না চাওয়া, রুক্ষ, খিটখিটে মেজাজ, সব সময় অমঙ্গলের আশঙ্কা জাগতে থাকে। বাইরে থেকে ফ্যাকাসে ও বিমর্ষ অবস্থায় দেখা যায়, শরীরে লোহিত কণিকা কমতে থাকে, বাড়তে থাকে শ্বেত কণিকা, সাধকের মধ্যে এই সময়ে তমঃ গুণের লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পায়।

(২) নং— নাম স্বাধিষ্ঠান, মূলাধারের উপরিস্থল, এখানে ধ্যান করার সময় নানা অলৌকিক জিনিষ ঘটতে দেখা যায়। যক্ষ, রক্ষ, ধনরত্ন, টাকা পয়সা উড়ছে, সুন্দরী নারীর আহ্বান—মোহিনী রূপে অশুভ ইশারা ইঙ্গিত সব এখানে। এই অবস্থায় আটকে গেলে সাধন জীবনে প্রভূত টাকা পয়সা ধন দৌলত কিংবা যশ মান খ্যাতির অধিকারী হওয়া যায়, সাধকের জীবনে বহু নারীরও সমাগম ঘটে থাকে। সাধুদের এটাই বিভূতি যোগ—আশুরিক ক্ষমতা, এগিয়ে যাওয়ার পথে বাধা স্বরূপ। শেষের দিকে সাধকের জীবনে তমঃ গুণ কাটিয়ে রজঃ গুণের উদ্ভব হয়।

(৩) নং—নাম মণিপুরক, অবস্থান নাভির বিপরীত দিকে মেরুদণ্ডের স্থানে। পূর্বেকার ভোগ লিপ্সা কাটিয়ে উঠতে পারলে সাধন ভজনে ইচ্ছা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়। পাই কিংবা না পাই, শেষ দেখে ছাড়ব এ'রূপ জেদি ভাব জন্মে, রজঃগুণের প্রাবল্য ঘটে, কিন্তু শরীর জরাজীর্ণ হতে শুরু করে।

(৪) নং— নাম অনাহত, সাধন ভজনে দেহের অভ্যন্তর ভাগ থেকে মৌমাছির গুঞ্জন ধ্বনির ন্যায় এক অতি সুমধুর ধ্বনি শ্বাস প্রশ্বাসে আপনা

আপনি বের হতে থাকে। এর নাম 'নাদ' ধ্বনি বা 'ওঁকার' ধ্বনি। সাধকের মধ্যে শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসা, ঈশ্বরে প্রীতি ভাব জন্মে, শরীর জীর্ণ থেকে জীর্ণতর হয়, শেষ পর্যন্ত টিকে থাকত পারলে সাধক রজঃগুণের প্রভাব কাটিয়ে সত্ত্বগুণের দ্বারদেশে উপনীত হয়।

(৫) নং—নাম বিশুদ্ধ চক্র, সাধন ভজনে বহু নতুন নতুন অলৌকিক জিনিস ঘটতে থাকে, যাকে কেন্দ্র করে সাধকের বিশ্বাস ঘনীভূত হতে থাকে। সাধন ভজনে এগোনোর পথ প্রশস্ত হয়। সত্ত্বগুণের প্রাবল্য ঘটতে থাকে, শরীর আরো জরাজীর্ণ হতে থাকে।

(৬) নং—নাম আজ্ঞা চক্র, সাধকের জীবনে কঠিনতম পরীক্ষা। কথা বলা খাওয়া ঘুমানো বসা শোওয়া সর্বত্রই অস্বস্তি আর অস্থিরতা, জীবন যায় যায়, এখন সাধকের আহার নিদ্রা সব আপনা আপনি ত্যাগ হয়ে যায়, কেবল ব্যাগ্রতা ব্যাকুলতা আর উৎকণ্ঠা, কেবল ভজন সাধন আর সাধন ভজন। প্রভু আরোও একটি দিন কেটে গেল, কাজের কাজ কিছুই হল না, তোমার দেখা তো মিলল না, মনের মধ্যে এই বেদনা। তমঃ এবং রজঃ গুণের প্রভাব কাটিয়ে সত্ব গুণের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব হয়।

এই ভাবে একের পর এক ক্রমান্বয়ে ছয়টি স্তর বা চক্র ভেদ করে সপ্তম স্তরে হয় ঈশ্বর দর্শন।

এখানে যে কথাটি বলে রাখার দরকার তা হল যৌগিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া বা সাধন পথে ছয়টি স্তর অতিক্রম শেষে ষট্‌চক্র ভেদ করা পর্যন্ত এগোনো খুব বেশী কষ্টকর নয়, কিন্তু সব থেকে কষ্টকর দৈনিক ভোর, দুপুর এবং সন্ধ্যা এই তিন সন্ধ্যায় নিয়মিত Routine follow up করে সাধন ভজন করা। সময়ের সামান্য কিছু হেরফের হতে পারে কিন্তু একবার ছেদ পড়লে তার সামাল দেওয়া খুবই মুশকিল হয়ে যায়। ঈশ্বরের কৃপা বা অনুগ্রহ না হলে ঐ নির্দিষ্ট সময়টুকুও পাওয়া যায় না।

এখানে আরো যে কথাটি বলে রাখতে হয় তা হল ষট্‌চক্রভেদে সপ্তম স্তরে কেবলমাত্র ঈশ্বর দর্শন হতে পারে, কিন্তু তার মহিমা বা লীলাখেলা অর্থাৎ সৃষ্টির গুহ্য রহস্য ভেদ করা সম্ভব হবে না—এর জন্য সাধককে আরো ৭টি শক্তির স্তর ভেদ করতে হয়। এই সুদীর্ঘ ২৭ বছর সময় যৌগিক ক্রিয়া কৌশলে এগোনো ছাড়া সৃষ্টির রহস্য ভেদ করার দ্বিতীয় কোনও রাস্তা নেই। মনে রাখার দরকার আমাদের সব কিছু ও সবাকার সৃষ্টিকর্তা এক,

তাকে জানা এবং তার সাথে বোঝাপড়ার পথও এক, দ্বিতীয় কোনও পথ নেই।

মূলাধার থেকে সহস্রা

আমাদের জীবকুল সৃষ্টির রহস্যজাল সৌরলোকে, ওখানেই আমাদের পরিচালন ব্যবস্থার সমস্ত কিছু। কিন্তু সব থেকে মজার ব্যাপার ঐ রহস্য কাটিয়ে ওঠার তথা উদঘাটন করার চাবিকাঠি আছে এই মর্ত্যলোকে, মর্ত্যের মানুষের কাছে।

এই চাবি খোলার কাজে সব থেকে বেশী সাহায্য ও সহায়তা করে থাকে আমাদের মানবদেহ রূপ যন্ত্রটি। এই যন্ত্রের অশেষ গুণ। এই যন্ত্রটিকে অতি সুনিপুণভাবে কাজে লাগাতে পারলে সৃষ্টি রহস্যের সমস্ত কিছু তথ্য জানা যায়।

কোনও জীবের পক্ষে জীবন নিয়ে অর্থাৎ জীবিত অবস্থায় সৌরলোকে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তার প্রধান কারণ পৃথিবীর মায়াজাল, আমরা জীবকুল প্রত্যেকেই এই জালে বন্দী। পৃথিবীর একদিকে অভ্যন্তর ভাগে আছে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যা পৃথিবীর প্রতিটি জিনিসকে কেন্দ্রের দিকে টেনে রেখেছে, অপরদিকে পৃথিবীর বহির্ভাগে আছে বিরাট বায়ুমণ্ডল যা ব্যূহ সৃষ্টি করে আমাদের জীবকুল সহ পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুকে উপর থেকে নীচের দিকে ঠেলে রেখেছে। বিজ্ঞানের দৌলতে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বেড়াজাল কাটিয়ে আমরা বায়ুমন্ডল ছাড়িয়ে মহাকাশে বা গ্রহান্তরে পাড়ি জমাতে সক্ষম হয়েছি কিন্তু কোনও জীবের পক্ষে বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে জীবন অর্থাৎ প্রাণবায়ু ছাড়া বা ব্যতিরেকে মহাকাশে তথা সৌরলোকে যাওয়া এখনো সম্ভব হয়নি।

বিজ্ঞানের এই অসমাপ্ত কাজটি করতে পারে মানুষ, একমাত্র যৌগিক ক্রিয়া কৌশলাদি অবলম্বনে। এর জন্য বহির্বিশ্বে বা সৌরলোকে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না, এখান অর্থাৎ এই পৃথিবীর মাটিতে বসে এ জিনিস সুসম্পন্ন করা বা বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব। কেবল দরকার চেষ্টা, আগ্রহ, নিষ্ঠা, একাগ্রতা, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ব্যাকুলতা নিয়ে নির্দিষ্ট পথ ধরে এগোতে থাকা।

এই কাজে জীবনের প্রথম একেবারে শৈশাবস্থা থেকে শরীর চর্চা বা গঠন করার দরকার। কাঠামো মজবুত না করে কমজোরী থাকলে কাজের কাজ কিছুই হবে না, যে কোনও সময়ে ভেঙে ধ্বস নেমে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। সুতরাং সবার আগে দরকার শরীর গঠন তার পর যৌগিক ক্রিয়া প্রক্রিয়াদির কাজ।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আছে শক্তির ৭টি স্তর, সাধন ভজনেও আছে ৭টি গ্রন্থি। সাধককে ঐ গ্রন্থি সমূহ অতি ধীরে ধীরে অতিক্রম করে যেতে হয়। এর জন্য প্রথমেই কাজ শুরু হয় মূলাধার থেকে। এখানে কুল কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত করতে হয়, কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত করার অর্থ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব খর্ব করা, মূলাধারে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত করার পর সাধককে ক্রমান্বয়ে আরো স্বাধিষ্ঠান, মণিপূরক, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা চক্র রূপ গ্রন্থিগুলি একে একে অতিক্রম করে যেতে হয়। ছয়টি চক্র বা ষট্ চক্র ভেদ করার পর সপ্তম স্তরে সাধক পান আর এক চোখ তৃতীয় চোখে দেখার অস্বাভাবিক ক্ষমতা, পান ত্রিনয়ন। দেখতে পান সৃষ্টির আলো। কোন কোনও সাধক এই সময় বিশেষ কিছু অলৌকিক বার্তা বা দৈববাণীও পেয়ে যান। দর্শনাচার্য ভীমানন্দ এখানে যে শুভ বার্তাটি পেয়েছেন তা হল "ভারতের বুকে একদিন শ্রেষ্ঠ দর্শন যোগীরূপে প্রতিভাত হবে"।

ঠিকমতো Route মেনে এগোতে থাকলে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত হওয়ার পর থেকে সৃষ্টির আলো পেতে একজন সাধকের মায়েদের গর্ভ সঞ্চার থেকে শুরু করে সন্তান প্রসব করার অর্থাৎ কমপক্ষে ২৭০ থেকে ২৮০ দিন সময় লেগে যায়।

ষট্ চক্র ভেদে সাধকের ভ্রূ-দ্বয়ের মাঝখানে কূটস্থে সহসা দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে। এ আগুন সাধারণ আগুন নয়, জ্বলন্ত আগুনের লেলিহান শিখা, সমস্ত কিছুকেই নিমেষের মধ্যে গ্রাস করে নিতে চায়, খণ্ড ভণ্ড কি ওলট পালট করে দিতে চায় এতোদিনকার অর্জিত সমস্ত কিছু। প্রাণ রাখাই দায় হয়ে উঠে। কিন্তু টিকে থাকতে পারলে অসম্ভবও সম্ভব হয়ে যায়। সাধক এক বিরাট জ্ঞানের ভাণ্ডারের অধিকারী হয়ে যায়।

সাধকের ত্রিনয়নের আগুনে এখন ভাসতে থাকে অতীতের বহু হারিয়ে যাওয়া দৃশ্য ও ঘটনাবলি, রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় পৃথিবীর বুকে ঘটে যাওয়া বড় বড় যুদ্ধবিগ্রহগুলি নিছক কাল্পনিক কি কল্পনা প্রসূত নয় তা এখানেই ধরা পড়ে। ইথার তরঙ্গে এ'সব জিনিস এখানো মহাকাশে ধরা আছে। এখানেই জানা যায় ঈশ্বরের সাকার ও নিরাকার এই দুই আকার কি জন্য কোথায় কীভাবে এবং তৎসহ প্রভেদ কতখানি আছে। এই ষট্চক্র ভেদের পরেই জানা যায় সৃষ্টিতে মানব মূর্তির কায়দা কানুনের ও বিধিব্যবস্থার কথা। সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের তিন প্রতীক তিন দেবতা যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের কথা ও কাহিনী এখানেই পরিষ্কার হয়ে যায়। হিন্দু ধর্মে যে

কোটি কোটি দেবদেবীর ধারণা তা মোটেই অন্তঃসারশূন্য নয়, তার সারবত্তা এখনই বোধ হয়। ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে এদের আগমন সাধকের মধ্যে শিহরণ খেলে যায়। এর পর ত্রিনয়নের ঐ আলোকে একে একে আর্বিভূত হন ঈশ্বরীয় পথের পথিকগণ বিভিন্ন অবতার, মহাপুরুষ থেকে শুরু করে সাধু মুনি ঋষির দল। ছবি বা অন্য কোনও মাধ্যমে আগেভাগে চেনাজানা না থাকলে এদেরকে চিহ্নিত করা যায় না। এরা প্রত্যেকেই সাধকের মনের থেকে সমস্ত রকম ভয় ভীতি কাটিয়ে আশ্বস্ত করেন ও ভরসা দেন, কিন্তু সমস্ত কিছুই ঘটে থাকে নীরবে, ইশারা ইঙ্গিতে ডান হাত তুলে আশীর্বাদ সূচক ভঙ্গিমায় অভয়দানের মাধ্যমে।

সাধকের এই সময়কার অবস্থান পৃথিবী ও সৌরলোকের সঙ্গমস্থল যথাক্রমে বায়ুপূর্ণ ও বায়ুশূন্য স্থানে। সাধক দেখতে থাকেন আকাশের বুকে কেবলই আলো। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ ইত্যাদি আলো আর রঙ বেরঙের আলোর ছটা ও জ্যোতি, যৌগিক পরিভাষায় এর নাম কসমল জ্যোতি। আলোর এই বাহার ও ঝিকি-মিকি ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলে যায়। এর মধ্যেই ভেসে ওঠে ফুল, ফুলের মালা, রামধনুর মতো আরো অনেক অনেক কিছু যা বলে শেষ করা যায় না। বিশ্বপ্রকৃতির এই অপরূপ, মনোমুগ্ধকর দৃশ্য সমূহ থেকে অন্য কোনও দিকে সাধক চোখ ফেরাতে পারে না। কেবল দেখা আর দেখা, সাগরের ঢেউ যেমন, সাধকেরও তেমন এ দেখা। এ দেখার যেমন শেষ কোথায় সাধক জানতে পারে না, তেমনি এর রূপেরও বর্ণনা দিতে পারে না। সাধক দিশেহারা বিহ্বল হয়ে পড়ে। সাধক অভিভূত আপ্লুত হয়ে যায়, জগৎ সংসারের সমস্ত কিছু মিথ্যা মেকি মনে হয়। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থায় এসে পৌঁছায় খাওয়া শোওয়া বসা ঘুমানো কথা বলা কোন কিছুতেই স্থির থাকতে পারে না—সর্বত্রই অস্থিরতা আর অস্থির অবস্থা। পাগলের মতো অহরহ নিজ মনে বিড়বিড় করে কথা বলতে থাকে, রাস্তাঘাটে নেশাখোরের মতো টলতে টলতে চলতে থাকে। শরীর হয়ে যায় জরাজীর্ণ কঙ্কালসার, ঠেলে দিলে পড়ে যাবার মতোই অবস্থা। এ এক অসহনীয়, সাধকের প্রাণ প্রাণান্তকর অবস্থা।

কিন্তু বিপদ শুধু এখানেই নয়, বিপদ আছে অন্যত্রও। এই সময় সাধকের প্রাণবায়ুর মধ্যেও গতির পরিবর্তন সূচিত হয়। এতোদিন সাধকের শ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যে যে প্রাণবায়ুর গতি ছিল পৃথিবীর রেখিক গতির অনুরূপ তা এখন Brain-এ সূর্যের আবর্তন গতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে থাকে, ক্রমে ক্রমে এই প্রাণবায়ু নিঃশেষিত হতে থাকে। সৌরলোকে প্রাণবায়ু ব্যতিরেকে

বেঁচে থাকা সীতার অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে বেঁচে থাকার পরীক্ষার সমান, যমে মানুষে টানাটানি। ফলে Brain-এর উপর অসহ্য চাপ পড়ে, অসহনীয় জ্বালার উদ্ভব হয়। শেষ পর্যন্ত সাধককে সাধন ভজনের পথ পরিহার করে নীচে নেমে আসতে হয়, নতুবা মৃত্যু অবধারিত।

সাধকের পক্ষে এই মহাবিপদও কাটিয়ে ওঠা সম্ভব, যার জন্য দরকার হয় গুরুর কৃপা, নিজ স্ত্রীর পূর্ণ সহায়তা। এই অবস্থায় গুরু সূক্ষ্মদেহে শিষ্যকে আবার দীক্ষা দেন। সাধকও নিজ স্ত্রীকে মা জগদ্ধাত্রী রূপে পূজা করেন। সন্তানরূপে নিজ স্ত্রীর স্তন দুগ্ধ পান করেন—নতুবা এ জ্বালা কাটানো যায় না বা নিবৃত্ত হয় না। সর্বোপরি চাই ঈশ্বরের অহৈতুকী কৃপা, যার জন্য চাই জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতি। অবশেষে ৫/৬ মাস পরে সাধকের ভাগ্যে ঘটে থাকে জ্বালা যন্ত্রণা থেকে চিরমুক্তি।

ষট্‌চক্রভেদে সপ্তম স্তরে সাধকের ত্রিনয়নে ধরা পড়া লাল লেলিহান শিখা এখন গোলাকার শ্বেত শুভ্র জ্যোৎস্নার রূপ নেয়। সাধকের অবস্থান এখন সৌরলোকে বায়ুশূন্য স্থানে। এখন সে প্রকৃতির Magnet। তৃতীয় চোখে ধরা পড়তে থাকা দৃশ্যসমূহ থেকে দিনরাত বোঝাপড়া আর বোঝাপড়া। সৃষ্টিতে কোনটা কি, কেন, কি-জন্য কখন, কীভাবে এরূপ বহুমুখী প্রশ্ন ও তার উত্তর—এককথায় সৃষ্টি রহস্য উন্মোচন করা, সাধকের জীবনের আরো পরের ২৭ বছর সময়কার কথা।

কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির এমনি এক নিয়ম সেখানে কোন সাধক ত্রিনয়ন লাভ করার পর বায়ুশূন্য সৌরলোকের শক্তির আরো ৭টি স্তর ভেদ করে সৃষ্টি রহস্য উন্মোচনে সমর্থ হলেও সৃষ্টির নাড়ি নক্ষত্র সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ব করতে পারেন না, কেবলমাত্র পৃথিবীর বুকে যখন যে বার্তাটি পৌঁছে দেওয়ার দরকার নীরব ঈশ্বর থেকে জ্ঞানচক্ষুর মাধ্যমে তিনি কেবল সেই বার্তাটুকুই পেয়ে থাকেন, এর বেশী নয়। এখানে দর্শনযোগী যোগীবর ভীমানন্দ যে শুভ বার্তাটি পেয়েছেন তা হল পৃথিবীর বিপন্ন মনুষ্যকুলকে বাঁচানোর বার্তা, আজকের এই ক্ষয়িষ্ণু ও বভুক্ষু সমাজের অস্থিরতা কাটিয়ে তোলার সমস্তরকম পথ নির্দেশ।

সূর্যের আলো—উৎপত্তি কোথা থেকে?

সূর্য সম্বন্ধে আমাদের সবাইকার যে ধারণা থেকে গেছে তা সঠিক নয়। ভ্রান্ত ধারণা। এর কারণ সৃষ্টির প্রকৃত রহস্য আমাদের না জানা।

সূর্য ও পৃথিবী উভয়েই বিশ্বপ্রকৃতির একই শক্তিতে সৃষ্ট পৃথিবীর প্রাণীকুলের স্বার্থেই। আবার সূর্যের উপর পৃথিবীর জীবকুল নির্ভরশীল এ-কথা যেমন সত্য, পৃথিবীর জীবকুলের উপর সূর্যও ততোধিক নির্ভরশীল অর্থাৎ মরণ বাঁচন এও সমানভাবে সত্য।

সূর্য থেকে আমরা যে আলো ও তাপ পেয়ে থাকি এ তার নিজস্ব নয়, কেবল শোধন করে দেওয়া। সূর্য এমনি এক বিশেষ ধরণের উনুন বা চুল্লি যা দূষিতকে পুড়িয়ে ভালোটা পৃথিবীর জীবকুলের জন্য পাঠিয়ে দিচ্ছে, সূর্যের কাজ দূষিত গ্যাস টেনে পুড়িয়ে দেওয়া।

Bulb-এ যেমন আলো নেই, আছে বৈদ্যুতিক তারেতে, কিন্তু প্রকাশ Bulb-এ—তেমনি সূর্যতে আলো নেই, আছে পৃথিবীতে, পৃথিবীর জীবকুলের মধ্যে। সূর্যের যে অফুরন্ত আলো এবং তাপ তার উৎস আমরা, এই পৃথিবীর জীবকুল। সূর্যের মধ্যে আছে ঐ আলো ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা অর্থাৎ প্রকাশ, যথাক্রমে টর্চ এবং তার ব্যাটারির সাথে যা তুলনীয়।

সূর্য না থাকলেও পৃথিবী থাকবে তার পতন হবে না, কিন্তু জীবকুলের ধ্বংস অনিবার্য, অপরদিকে পৃথিবীর জীবকুল না থাকলে সূর্যতেও আর আলো থাকবে না, সূর্য তার জৌলুস হারাতে বাধ্য।

স্বর্গ

স্বর্গ অর্থে দেবলোক, আলোর রাজ্য, দেব-দেবীর আবাস স্থল, যেখানে দেহ যায় না। স্বর্গ বিশেষ এক নিয়ম নীতির স্থান, বোঝাপড়ার ক্ষেত্র। এখানে পৌঁছালেই সঠিক বেঠিক স্থায়ী অস্থায়ী ঠিক ভুল সমস্ত কিছু ধরা পড়ে। আমরা স্বর্গ অর্থে ঊর্ধ্বে আকাশ পানে দৃষ্টি দিই, তার কারণ প্রাণীকুলের পরিচালন শক্তির পুরোটাই আমাদের মাথার উপর মহাকাশে গচ্ছিত, সূর্য যেখানকার অধিপতি।

মানবদেহে স্বর্গের অবস্থান মস্তিষ্কে, এখানেই সঠিক বেঠিক সত্য-মিথ্যা উচিত-অনুচিত সব কিছুই ধরা পড়ে। তবে এগুলি সাধারণ চোখ দুটিতে ধরা পড়ে না। এর জন্য তৃতীয় চক্ষু বা জ্ঞানচক্ষু জাগরিত করতে হয়, এই-ই হল মানব শরীরে জ্ঞান সূর্য। কর্মনেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ছাড়িয়ে অন্তরিন্দ্রিয় বিকশিত করা ছাড়া এ পথে এগোনোর দ্বিতীয় কোনও রাস্তা নেই।

স্বর্গ মর্ত্য পাতাল

হিন্দু শাস্ত্র মতে মানুষের অবস্থান ও যাতায়াত স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই তিন ভুবনের মধ্যে। আমরা প্রতিটি মানুষ, বাস করি মর্ত্যে অর্থাৎ এই

সসাগরা পৃথিবীতে। আমরা বিশ্বাস করি পুণ্যবানেরা মৃত্যুর পরে যেখানে বসবাস করেন তা স্বর্গ এবং পাপীরা যে স্থানে শাস্তিভোগ করে থাকেন তার নাম পাতাল। এই মর্তধাম হাসি কান্নায় ভরা, এখানে যেমন সুখ আছে তেমনি দুঃখও আছে। স্বর্গের অপর নাম দেবলোক অর্থে চির শান্তির রাজ্য। অপরদিকে পাতাল অর্থে অত্যন্ত নোংরা জঘন্য ও যন্ত্রণাদায়ক অর্থে চির দুঃখ কষ্টের জায়গাকে বোঝায়।

মর্ত্য সম্পর্কে আমরা কমবেশী ওয়াকিবহাল থাকলেও স্বর্গ অথবা পাতাল সম্পর্কে আমাদের কারো কোনও সঠিক ধারণা নেই। আমাদের সমস্ত কিছু কাজ কারবার এই মর্ত্যলোকে। স্বর্গ অথবা পাতাল অর্থে যথাক্রমে উর্ধ্বাকাশ এবং মাটির নিম্নভাগকে আমরা সবাই দেখিয়ে থাকি, কিন্তু কেহ কোনদিন ওখান থেকে দেখে আসেননি।

প্রকৃতপক্ষে স্বর্গ হল আলোর রাজ্য বা জ্ঞানের রাজত্ব, বোঝাপড়ার স্থান। আমাদের বোঝাপড়া তথা পরিচালনা ব্যবস্থার সমস্ত কিছু উপরে সৌরলোকে, সেই কারণে স্বর্গ অর্থে আমরা উর্ধ্বাকাশে দেখাই। অপরদিকে পাতাল অর্থে অন্ধকারের রাজত্ব, সেখানে জ্ঞানের আলো প্রবেশ করেনি। মানুষের মধ্যে জ্ঞান সঞ্চার না ঘটলে উপরে উঠতে পারে না। নীচে অর্থাৎ পাতালে (বা পায়ের তলায়) থেকে যেতে হয়। মর্ত্য হল স্বর্গ ও পাতালের মাঝে। এখানকার এমন ক্ষমতা, এমনি বৈশিষ্ট্য যে এখানে মানুষ ভুলগুলি শোধরাতে পারে, এই ভুল শোধরে উপরে উঠতে পারলেই স্বর্গে অবস্থান নতুবা নিম্নে পাতালে বসবাস।

যুধিষ্ঠির একা স্বর্গে যেতে পারলেন — কারণ কি?

পঞ্চ পাণ্ডবদের পাঁচ ভাই প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা কিন্তু বিশেষ বিশেষ গুণের অধিকারী—এরা মানবশরীরের বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় স্বরূপ। প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সমান আস্থাবান ও শ্রদ্ধাশীল—বাহিরাঙ্গ ভক্ত। এদের মধ্যে অর্জুনের ক্ষমতা সবার থেকে বেশী কিন্তু সাপশক্তি যা স্বর্গে বা জ্ঞানের পথে বাধাস্বরূপ। অপরদিকে যুধিষ্ঠির সবার উপরে—ধীর স্থির সত্যবাদী, ন্যায়নীতিবিদ ও ধর্মপরায়ণ। পঞ্চনেন্দ্রিয়ের স্থূল চক্ষুদ্বয় ছাড়িয়ে জ্ঞানচক্ষু সদৃশ ক্ষমতার অধিকারী—আত্মা স্বরূপ শক্তি, অন্তরাঙ্গ ভক্তি ও জ্ঞানসম্পন্ন। ফলে একমাত্র যুধিষ্ঠির জীবিত অবস্থায় স্বর্গে যেতে পারলেন, অন্য কেহই পারলেন না।

এখান থেকে আমরা যে বিশেষ শিক্ষা পেয়ে থাকি তা হল যিনি যে কাজে যেরূপ পারদর্শিতা অর্জন করেন তিনি সেই কাজে অনুরূপ ফল পেয়ে থাকেন। মানসিক শক্তিতে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন যুধিষ্ঠির স্বর্গে যেতে সক্ষম হয়েছেন, কিন্তু বিশ্বরূপ দেখতে সমর্থ হননি। অপরদিকে শারীরিক শক্তিতে ভরপুর অর্জুন স্বর্গে যেতে না পারলেও নিজ শরীরের কাঠামোগত শক্তির গুণে বিশ্বরূপ দেখতে সমর্থ হয়েছেন।

ঈশ্বর সাধনা কি ?

অন্যান্য সাধনার ন্যায় ঈশ্বর সাধনা—ঈশ্বরকে পাওয়ার লক্ষ্য। সৃষ্টির মূলকে জানার জন্যই দরকার এই সাধনা। দুধের মধ্যে আছে আগুনকে নিভিয়ে দেওয়ার সাধারণ ক্ষমতা, অথচ ঐ দুধের ভেতর লুকিয়ে আছে অসাধারণ এক দাহিকা শক্তি যা বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি ঘি-এর মধ্য দিয়ে পাওয়া যায়। তেমনি প্রতিটি মানুষের বাহিরে ভেঙে যাবার আশুরিক শক্তি কাজ করলেও ভিতরে লুকিয়ে আছে বিশাল এক দেবসুলভ সুর শক্তি, যার দ্বারা অতি সুচতুর কৌশলে সৃষ্টির মূলকে জানা যায়। এই বিশেষ কৌশলটির নামই হল ঈশ্বর সাধনা বা আধ্যাত্মিক সাধনা।

ঈশ্বর সাধনার তিনটি ভাগ বা পথ—ধ্যান, ঈশ্বরীয় নাম গান জপ ও যৌগিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া অবলম্বন, যার নাম যোগ সাধনা। ধ্যানের দ্বারা সাধকের মধ্যে বিশেষ ক্ষমতা জন্মে— অনেক অলৌকিক জিনিস দেখা সম্ভব হয়। অহরহ নাম গান জপে Blood Purified হয়, মনে আসে শান্তি। দিনরাত ব্যাকুলতায় ঈশ্বরীয় নাম গানে আসক্তি আনতে পারলে দেব-দেবীর দর্শনও মিলে যেতে পারে, তবে ঐ পর্যন্তই, এর বেশী কিছু হবে না। যোগ সাধনা, সাধন ভজনের কঠিনতম পথ , তাই প্রাপ্তিও অনেক। একমাত্র যোগ সাধনার দ্বারা সৃষ্টির গুহ্য রহস্য ভেদ করা সম্ভব হয়। কিন্তু বাল্যকাল থেকে শরীর তৈরি না থাকলে ধ্যান অথবা যৌগিক ক্রিয়া প্রক্রিয়াদি অবলম্বনে সাধন ভজন করা সম্ভব নয়, কিন্তু নাম জপ করা সম্ভব। সেই কারণে সবাইকার বিশেষ করে বার্ধক্যকালে নাম গান জপ করাতে কোনও অসুবিধা নেই।

যোগ সাধনা কি?

যোগ অর্থে যুক্ত হওয়া বা যুক্ত করা—সৃষ্টির সাথে সৃষ্টের, গৃহীর সাথে অগৃহীর, কর্মের সাথে কর্মীর, ভক্তের সাথে ভক্তির। সৃষ্টিকর্তা একাকী ছিলেন, সৃষ্টির প্রয়োজনে হলেন এক থেকে বহু। এলেন নিরাকার থেকে সাকারে।

যে সাধনার দ্বারা এক থেকে বহুতে অথবা উল্টোভাবে বহুর মধ্য দিয়ে একে পৌঁছে যাওয়া বা যুক্ত হওয়া যায় তারই নাম যোগ সাধনা। এই যোগ সাধনার সহযোগেই জীব জীবাত্মার মধ্য দিয়ে পরমাত্মাতেও পৌঁছে যেতে সক্ষম হয়।

যোগ সাধনার মূল কথা প্রাণের সাথে মনের মিলন ঘটানো বা যোগ সাধনা করা, প্রাণায়াম যার নাম। এ অতি কঠিন কাজ, খাওয়া, কথা বলা, বিশ্রাম, ঘুমানো, প্রসাব, পায়খানা থেকে শুরু করে সাধন ভজন সমস্ত কিছুতেই মাপ জোখ। পান থেকে চুন খসলেই সমূহ বিপদ। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী রোগী বা ভোগী কোন কিছুতে ছাড় নেই। রুটিন অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে নিয়ে সব কিছুই করতে হয়, নতুবা পদস্খলন ঘটে যাওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা, —মৃত্যু পর্যন্ত ঘটেও যেতে পারে।

আগেই বলা হয়েছে এ পথ অতি দুর্গম পথ। উপযুক্ত পথ প্রদর্শক তথা গুরু ছাড়া কেবল নেশার ঝোঁকে এ পথে এগোনো বা পা বাড়ানো একেবারেই যুক্তিযুক্ত নয়। তবে প্রকৃতির এমনি System—যিনি চিনি খোঁজেন চিন্তামনি তাকে তা যুগিয়েও দেন। এ পথে হাঁটতে থাকলে যখন যেরূপ দরকার সেরূপ পথ নির্দেশ কোন না কোনও ভাবে মিলেও যায়। এই পাওয়াটি বিভিন্ন গ্রন্থ, লোকজনের কথাবার্তা, বিভিন্ন পত্র পত্রিকা, সাধু-ঋষিদের আলোচনা এমনকি স্বপ্নের মধ্য দিয়েও হতে পারে। সুতরাং ইচ্ছা থাকলে উপায়ও হয়ে যায়—তাই নয় কি?

যৌগিক সাধন শিক্ষা

যৌগিক সাধন শিক্ষা এমনি এক বিশেষ শিক্ষা যার দ্বারা জীব নিজে তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শক্তির মধ্য দিয়ে সৃষ্টির মূলে থাকা সেই সে পুঞ্জীভূত বৃহৎ অথচ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শক্তিতে পৌঁছে যেতে সক্ষম হয়। একমাত্র এই শিক্ষার সহযোগেই সৃষ্টির গুহ্যতম রহস্য ভেদ করা সম্ভব হয়, অন্য কোনও পথ নেই বা পথে হয় না।

জলকে মেরে বা বাষ্পায়িত করে যেমন লবণ পাওয়া যায় তেমনি যৌগিক সাধন শিক্ষার সহযোগে প্রাণকে মেরে মনের সন্ধান পাওয়া যায় — তখনি বোঝা যায় ঈশ্বরের ছোঁয়াচ ও অস্তিত্ব। মন প্রকৃতির দাস, কিন্তু একমাত্র যৌগিক কলা কৌশলাদির দ্বারা মনকে নিজের দাস বানানো সম্ভব হয়।

আমাদের শরীরে যে প্রাণবায়ু প্রবাহিত আছে তার গতি নীচের থেকে উপরের দিকে, যৌগিক সাধন শিক্ষায় ঐ গতি নীচ থেকে উপরের দিকে

প্রবাহিত করতে হয়। শুধু তাই-ই নয়, যৌগিক ক্রিয়া সাধন শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য থাকে শরীর থেকে ক্রমান্বয়ে প্রাণবায়ু নিঃশেষিত করা। এর দ্বারা শরীর ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্ত হতে থাকে তেমনি সৃষ্টির গুহ্যতম রহস্য ভেদ করার শারীরিক মজবুত কাঠামো তৈরি হয়ে যায়।

মহামুনি পতঞ্জলি যোগসূত্র সমন্বিত যোগ শাস্ত্রের প্রণেতা। আমরা কালক্রমে বাবাজী মহারাজ, শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়, স্বামী সত্যানন্দ, স্বামী যোগানন্দ এবং উত্তরোত্তর মহাপুরুষগণের মধ্য দিয়ে যোগশাস্ত্রে বর্ণিত যৌগিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার কথা কম বেশী জানতে পেরেছি।

সাধারণ ব্যায়াম এবং যৌগিক ব্যায়াম অভ্যাসের ফলে শরীরের মধ্যে অফুরন্ত এক শক্তির সঞ্চার ও আধিক্য ঘটে থাকে, দেহ মনে চঞ্চলতা দেখা দেয়। একে কব্জা করা বা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য যৌগিক সাধন শিক্ষার দরকার হয়ে পড়ে খুব বেশী।

আমরা পৃথিবীর প্রাণীকুল যে মায়ার জালে আবদ্ধ আছি তার প্রধান কারণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। এ সব সময়েই আমাদেরকে নীচের দিকে টেনে রেখেছে, কোনও সময়ে উপরে সৌরলোকে পৌঁছাতে দিচ্ছে না, ফলে আমরা সত্যাসত্য নির্ণয়ে অক্ষম, সঠিক বেঠিক, উচিত অনুচিত ধরতে পারছি না। একমাত্র এই যোগসাধন শিক্ষার সহযোগে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রাবল্য কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। সম্ভব প্রকৃতির সাথে প্রকৃত বোঝাপড়া। একমাত্র যৌগিক সাধন শিক্ষার দ্বারাই প্রাণীরা প্রাণেতে কিভাবে বাঁধা আছে বিশ্বপ্রকৃতির সাথে, এর যোগসূত্রই বা কি তা অনুধাবন করা সম্ভব।

যৌগিক সাধন শিক্ষার মূল কথা প্রাণ এবং অপ্রাণ অর্থাৎ যথাক্রমে জন্ম ও মৃত্যুকে সম অর্থাৎ সমান জ্ঞান করা। এর জন্য আছে একটি মাত্রই পথ— প্রাণকে মেরে মনের সাধনা করা, এর জন্য প্রাণবায়ুকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজনে নিঃশেষিত করে এগোতে হয়। এ কাজ রাতারাতি বা একদিনেই সম্ভব নয়। দীর্ঘ অধ্যবসায়, একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও আত্মপ্রত্যয় নিয়ে যৌগিক সাধনভজনের পথ ধরে অতি ধীরে ধীরে এগোতে হয়।

বিশ্বপ্রকৃতির বুকে আছে শক্তির ১৪টি স্তর। যৌগিক সাধন প্রণালী শিক্ষাতেও আছে ৭টি + ৭টি মোট ১৪টি শিক্ষার স্তর, যেখানে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত করা দিয়ে কাজের শুরু, সহস্রায় গিয়ে শেষ। কেবলমাত্র শেষের ৭টি স্তরে অর্থাৎ ষট্ চক্রভেদ থেকে শুরু করে সহস্রায় পৌঁছাতে শিক্ষার্থীর জীবনের কম করে ২৭টি বছর চলে যায়।

সাধু কে?

বিশেষ পোষাক পরিচ্ছদ পরিহিত মঠ মন্দির আশ্রম গীর্জা গুম্ফার মতো কোন প্রতিষ্ঠানে প্রথিতাযশা ব্যক্তিদের আমরা সাধারণভাবে সাধু হিসাবে চিহ্নিত করে থাকি। কিন্তু প্রকৃত সাধু হবেন সেই জন যিনি সৎ অর্থাৎ সত্যকে জেনেছেন, যিনি স্ব অর্থাৎ নিজেকে জেনেছেন। পরম সত্য পরম সত্বারই বহিঃপ্রকাশ, এই পরম সত্বাকে জানলে নিজেকেও জানা হয়ে যায়।

কিন্তু ঐরূপ সাধু পাওয়া দুরূহ, দুর্লভ ব্যাপার, একমাত্র জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতির জোরেই তা পাওয়া সম্ভব। সেই কারণে বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত (উচ্চ শিক্ষা নহে) এবং উৎকৃষ্ট গুণাবলীতে ভূষিত, যে কোনও গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে আমরা সাধু হিসাবে ধরে নিতে পারি।

তবে, আমাদের সব সময়েই ভেবে রাখার দরকার আমাদের সুস্থ সমাজ সুন্দর জীবন গঠনে দরকার সৎ লোক — সাধু লোক, মোটেই তা নয়।

সাধু ও বিজ্ঞানী তফাৎ — কোথায়?

ডাক্তার কি ইঞ্জিনিয়ারের ন্যায় সাধু এবং বিজ্ঞানী দু'জন আলাদা আলাদা পথের পথিক, কিন্তু উভয়েরই চিন্তাভাবনা এক, —যেটি হল, সত্যের অনুসন্ধান করা—অজানাকে জানা, এর জন্য একজন করেন আধ্যাত্ম সাধনা অপর জন বিজ্ঞান সাধনা।

বিজ্ঞানীরা তাদের বিজ্ঞান সাধনার কাজে বিভিন্ন Element তথা শক্তির উৎসমুখ নিয়ে Culture করেন, এ'কাজে থাকে বহুমুখী ধাতব যন্ত্রপাতি, যার মধ্যে লোহা প্রধান। অপর দিকে সাধক সম্প্রদায় সৃষ্টির উৎসমুখ ধরতে চান, এ কাজে তারা ব্যবহার করে থাকেন একটি মাত্র যন্ত্র, যেটির নাম নিজ মানবদেহ, যার মূলে আছে প্রাণবায়ু রূপ বস্তুটি।

বিজ্ঞানীরা তাদের চিন্তার ফসল প্রামাণ্য রূপে সবার কাছে তুলে ধরতে পারেন। সাধুরা এটা পারেন না। এদের সমস্ত কিছুই অপ্রামাণ্যের মধ্যেও প্রামাণ্য, কিন্তু তা কেবল নিজের কাছে, প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে ধরা, সৃষ্টির নিয়মেই এমনটি তৈরি।

পাথর থেকেই পাথরবাটি, মূলতঃ এক, কিন্তু ব্যবহারিকে ভিন্ন ভিন্ন। ঈশ্বর সদৃশ জিনিসটিও তাই, বিজ্ঞানীদের কাছে পাথর হয়ে জলে ডুবে আছে আর সাধুদের কাছে পাথরবাটি হয়ে জলে ভেসে আছে—তফাৎ কেবল এইটুকুর।

সাধকের আচরণ

সাধন ভজন করা এমন কিছুই কঠিন ব্যাপার নয়, কিন্তু যা কঠিন তা হল সাধকের আচার আচরণে, চলাফেরা কথাবার্তায়—সকাল দুপুর এবং সন্ধ্যা সময়ের সাথে তালে তাল মিলিয়ে চলার।

এর জন্য প্রথমেই দরকার শরীর গঠন এবং পরবর্তীকালে সময়ানুবর্তীতার সাথে সাথে নিয়মানুবর্তীতার। সময়ের সামান্য কিছু হেরফের হলেও ক্ষতির কিছুই নেই কিন্তু প্রাত্যহিক রুটিনে ছেদ পড়লেই একে একে সমস্ত কিছু শেষ হয়ে যাওয়া বা ভেস্তে যাবার সমূহ সম্ভাবনা। কাজেই সাধনভজন কালে আনন্দ স্ফূর্তি খেলাধূলা যাত্রা সিনেমা টিভি নাটক নাচগান দেখা, সভা সমিতিতে এমনকি ধর্মীয় অনুষ্ঠান সমূহ বিসর্জন দেওয়া বিধেয়। এ-সবের দ্বারা সাধন ভজনে লাভের থেকে ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশী। সেই কারণে গৃহীদের পক্ষে সংসারে থেকে সাধনভজন বিশেষতঃ সাধনভজনের উচ্চঃস্তরে ওঠা একরকম অসম্ভবপর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

সাধকের প্রতিদিনের আহার হবে পরিমিত, অতি বা অনাহার দুই-ই পরিত্যাজ্য। বাসী, এঁটো, পচা, তেতো, উৎকট টক বা ঝাল বেশী, বীজযুক্ত ফল বা বেশী কাঁটাযুক্ত মাছ কিছুই খাওয়া উচিত নয়। আমিষ অথবা নিরামিষ খাদ্য খাওয়া বা না খাওয়া সাধকের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভাল, কারণ সাধন ভজনে এগোতে থাকলে এমন এক সময় আপনা আপনি এসে যায় যখন সাধকের মন থেকে মাছ মাংস খাবার বাসনা দূরে চলে যায়। তবে মনে সুপ্ত বাসনা রেখে লোক দেখানো সাধু না সাজতে যাওয়াই ভাল। এতে এগিয়ে যাবার থেকে পিছিয়ে পড়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট বেশী।

আমাদের এ কথাটিও জানার দরকার আমরা জীবকুল অন্ধকারে থাকলেও যারে পেতে চাই তিনি সর্বদাই পবিত্রতার আলোকে আলোকিত। সেই কারণে সাধকের জামা কাপড় পোশাক পরিচ্ছদ, বিছানাপত্রাদি সবত্রই থাকবে বিশেষ পবিত্রতার ছাপ। এগুলি ব্যবহারেও থাকবে বিশেষ কিছু বিধি নিষেধ। সাধন ভজন কালে সাধকদের কৌপীন, সাধারণ গৃহী পুরুষ অথবা মহিলার পরিধানে থাকবে ল্যাঙট বা লেংটি। অন্যান্য সময়ে পরিধানে থাকবে মূলতঃ ধোওয়া সাদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিমছাম জামা কাপড়।

কিন্তু পরিধানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় চোপড়, মুখে মিষ্ট আচরণ কিন্তু অন্তরে কামনা বাসনায় ভরা কু-চিন্তা, কাজের কাজ কিছু হবে না। বিশেষতঃ

সাধু সেজে এ'রকম ব্যবহারে ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশী। মনে রাখতে হবে ময়ূর পুচ্ছধারী কাকের থেকে কাক যেমন অনেক ভাল তেমনি ভড়ং করে সাধু সেজে আশ্রমে বসবাস করার থেকে গৃহের মধ্যে গৃহী সেজে কামনা বাসনায় ডুবে থাকা ঢের ভাল।

সাধুদের লোকালয়ে থাকা উচিত নয়—কারণ কি?

দূষিত জিনিসের গুণ পরিবেশের উপর ছাপ ফেলে দেওয়া। যখনি কোন স্থানে বেশী লোকের সমাগম ঘটে তাদের আচার আচরণে বহুমুখী চিন্তা সাধুদের আচরণের উপর প্রভাব ফেলতে থাকে ও ক্রিয়া করে। ফলে সাধুদের নিজ নিজ ক্রিয়াকর্ম থেকে বিচ্যুতি ঘটতে পারে। এই জন্য সাধন ভজনে সাধুদের নীরব, নির্জন, নিভৃতে থাকাই বাঞ্ছনীয়। এই কারণেই বলা হয়েছে কোন গৃহীর বাড়ীতে সাধুদের তেরাত্রের বেশী কাটাতে নেই।

মাটির ঢিল শুকনো হলেও জল পেয়ে গলে যায় কিন্তু পুড়িয়ে শক্ত করে কাঠামো মজবুত করে নিতে পারলে আর ভয় নেই, তখন আর গলে না। সাধুদের বেলাতেও তাই। সাধুদের শারীরিক কাঠামোও আর পাঁচজনের দেহ কাঠামোর মতোই একই— নরম অর্থে কাঁচা। একে সাধনভজনে পাকা করে নিতে পারলে ভয়ের কিছুই থাকে না তখন হাজার হাজার লোকজনের সংস্রব বা প্রণাম গ্রহণেও হারিয়ে ফেলার কিছুই থাকে না। কাজেই নির্জন নিভৃতে থাকার প্রয়োজনও ফুরিয়ে যায়।

কিন্তু যোগিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ায় শেষের দিকে বিশেষতঃ রাজযোগে সাধকের পুষ্টিকর খাদ্যের দরকার হয়ে পড়ে খুব বেশী। সেই কারণে উপায়ন্তর না থাকলে সাধককে ঐ সময় লোকালয়ে বা রাজদরবারে আশ্রয় নিতেই হয়।

সাধুরা প্রয়োজনে নিজ দেহে অন্যের রোগ নিতে পারেন—ঠিক কিনা?

কথাটি ঠিক, সাধন ভজনের উচ্চস্তরে বিশেষ করে সিদ্ধিলাভের পর এ জিনিস বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব। এখানেই সাধুদের এই বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতা জন্মে। এই সময় সাধুদের পার্থিব সম্পদ, সুখ ভোগ, কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা লোপ পেয়ে যায়, টাকা পয়সা বিষয় সম্পত্তি বিষবৎ মূল্যহীন হয়ে পড়ে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মথুরবাবুর শীত নিবারণের জন্য দেওয়া শাল পর্যন্ত ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন।

বড় ডাক্তারের কাছে যেমন অনেক কঠিন রোগ ভাল হয়ে যায় অনুরূপভাবে বিশেষ ক্ষমতাবান মহাপুরুষদের সংস্পর্শে অন্যের দুরারোগ্য ব্যাধিও সেরে যায়। গিরিশ ঘোষের শারীরিক কাঠামোতে কোনও ভাঙন ধরেনি, সেই কারণে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশ ঘোষের Cancer নিজ দেহে ধারণ করেছিলেন, বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন মদ মাতাল নেশাখোর গিরিশ ঘোষকে। সাধক ব্যামাক্ষ্যাপাও বহু মুমূর্ষ রোগীকে বাঁচিয়ে তুলেছেন। শ্রীকৃষ্ণের হাতের স্পর্শে কুঁজ বিশিষ্টা কুব্জা পেয়েছেন দেহের বিকৃতি কুঁজ থেকে চির মুক্তি। উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সাধু ও মহাপুরুষগণ প্রয়োজনে মৃতে জীবন দানও করতে পারেন। শ্রীচৈতন্যদেবের মধ্যেও ঐ ক্ষমতার প্রকাশ হতে আমরা দেখেছি, শ্রীরামচন্দ্র পাষাণরূপী অহল্যার দেহে প্রাণের সঞ্চার ঘটিয়েছেন। তবে, এ'রূপ ঘটনা কাতারে কাতারে হবে না, খুবই সামান্য ২/১টি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সঙ্ঘটিত হতে পারে। ভক্তির সাথে শক্তির ঐরূপ মিলন প্রকৃতির ইশারা ইঙ্গিতের মাধ্যমে কদাচিৎ কালে ভদ্রে ঘটে থাকে। সাধারণের পক্ষে এর কূল কিনারা পাওয়া মুশকিল।

নারীদের যৌগিক ক্রিয়া কর্মাদি করা উচিত কি-না?

সাধন ভজনে পুরুষ-নারীতে কোনও ভেদাভেদ নেই, একই রকম। নারীরা নাম জপ-ধ্যান সাধন ভজন নিশ্চয়ই করতে পারেন, কিন্তু ক্রিয়া যোগ পদ্ধতি দেওয়া অথবা যৌগিক ক্রিয়া পদ্ধতিতে তাদের উদ্বুদ্ধ করা মোটেই উচিত নয়। কারণ মেয়েদের শারীরিক কাঠামোগত গুণ। মেয়েদের শারীরিক কাঠামো মজবুত নয়, হাল্কা। যৌগিক ক্রিয়া পদ্ধতি অবলম্বনে শরীরে যে বিশেষ প্রতিক্রিয়া বা চাপ সৃষ্টি হয় তা মেয়েদের পক্ষে ধারণ করা সম্ভব নয়, অসম্ভব। জোর করে অভ্যাস করলে পাগল হয়ে যাওয়াও মোটেই বিচিত্র ব্যাপার নয়—এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে যেতে পারে। নারীদের পক্ষে নাম-জপ ধ্যান করা সুবিধাজনক।

সেই কারণে নারীদের পক্ষে ভক্তিমার্গে সাধন ভজন করা বিধেয়।

যৌগিক ব্যাখ্যায় সমুদ্র মন্থন

পুরাণে বর্ণিত সমুদ্র মন্থন বাস্তবে ঘটেছিল, এ কোনও অলীক ঘটনা বা কাল্পনিক কাহিনী নয়। সমুদ্র মন্থনে পাওয়া গিয়েছে অমৃত, উঠেছে অমৃত ভাণ্ডার।

সাধুদের অমৃত পাওয়ার অর্থ জ্ঞানের ভাণ্ডার পাওয়া। পরম ব্রহ্ম পরম সত্যকে জানতে পারলে এই ভাণ্ডার হাতে পাওয়া যায়। এই কারণে সমুদ্রমন্থনের অনুরূপ নিজ নিজ মানব দেহকেও মন্থন করতে হয়। এরই নাম প্রাণকে মেরে অপ্রাণ তথা মনের সাধনা করা।

আমাদের বিধাতাপুরুষ খুবই কৃপাময়, অতীব দয়ালু। তিনি প্রতিটি মানবশরীরে সমুদ্রমন্থনে ব্যবহৃত সমস্তরকম উপকরণের অনুরূপ যাবতীয় উপকরণ যোগান দিয়েই রেখেছেন, এর জন্য অন্য কারো কাছে যাবার বা হাত পাতার দরকার নেই কিংবা দরকার হয় না। কেবল বুঝে সুঝে কাজে লাগালেই হল। সমুদ্র মন্থনের অনুরূপ মানবদেহের উপকরণ সমূহ হল —

উপকরণ	সমুদ্র মন্থনে ব্যবহৃত	মানবদেহ মন্থনে ব্যবহৃত
মন্থনপাত্র	সমুদ্র	মানবদেহ
মন্থন দণ্ড	মন্দার বা মন্দর পর্বত	মেরুদণ্ড (সুষুম্না)
রজ্জু	বাসুকী বা শেষনাগ	প্রাণবায়ু
রজ্জুর দুই প্রান্ত	শেষনাগের মুখ ও লেজ	শ্বাস ও প্রশ্বাস
দুই সহযোগী	দেবতা ও অসুর	ইড়া ও পিঙ্গলা
অমৃত ভাণ্ডার রক্ষক	লক্ষ্মীর বেশে মা মহামায়া	লক্ষ্মীস্বরূপ নিজ স্ত্রী

সমুদ্ররূপ মানব শরীর মন্থন করার জন্য সুষুম্না নামক মন্থন দণ্ড ব্যবহার করতে হয়। দেব এবং অসুর উভয়ের মিলিত শক্তিতে সম্পন্ন হয়েছিল সমুদ্র মন্থন। মানবদেহের সুষুম্নার বাম এবং ডান এই দুইদিকে আছে যথাক্রমে ইড়া ও পিঙ্গলা নামক দুই শ্বাসনালী। মানবদেহ মন্থনে এদের উভয়ের সহযোগিতা অনস্বীকার্য। মানবশরীরে শ্বাসই হল সাপের ফোঁস। এই হল মন্থন রজ্জু। সমুদ্র মন্থনে সমুদ্র গর্ভ থেকে বহু জিনিস মিলেছে, শেষে পাওয়া গেছে অমৃত। শেষনাগ ও মন্দার পর্বতের অহরহ ঘর্ষণের কঠোর পরিশ্রমে একদিকে দেব অসুর সবাই হয়েছে ক্লান্ত, অপরদিকে সমুদ্র গর্ভ হয়ে উঠেছিল বিষ বা গরলে ভর্তি। এই গরল পান করে শিব পৃথিবী রক্ষা করেছেন। অবশেষে শিব মা তারার স্তনদুগ্ধ পান করে দেহ রক্ষা করেছেন। শিব হয়েছেন মৃত্যুঞ্জয়ী, অমৃত পান করে দেবতাগণ হয়েছেন অমর।

শ্বাসবায়ুর সহযোগে মানবদেহকে অবিরত মন্থনের ফলে সাধকেরা অমৃতের সন্ধান পান, কিন্তু শরীর হয় ক্ষীণকায়, একেবারে জরাজীর্ণ। মানব শরীরে বিশেষ এক জ্বালা দেখা দেয় যা সমুদ্র মন্থনকালীন বিষের অনুরূপ। সাধকের বাঁচন মরণ অবস্থা এসে যায়, অমৃতত্ব অর্থাৎ জ্ঞানের ভাণ্ডার পেয়েও হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। এই বিষময় জ্বালা কাটিয়ে অমৃতত্ব রক্ষা করার জন্য সাধককে মা মহামায়ার স্মরণ নেওয়া ছাড়া বিকল্প কোনও পথ বা গত্যন্তর থাকে না। এখানেও সাধককে মাতৃজ্ঞানে নিজ স্ত্রীকে পূজা করতে হয়। নিজ স্ত্রীর স্তন দুগ্ধ পান করে অমৃতত্ব রক্ষা করতে হয়, নতুবা অচিরেই হারাতে হয় সমস্ত কিছু। সমুদ্র মন্থনে বিষের জ্বালা সহ্য করে মহাদেব পরিণত হয়েছেন শিবে, হয়েছেন শান্ত। জীবও তাই, এই সময় সাধকের জিহ্বামূল থেকে বিশেষ এক রস (যৌগিক পরিভাষায় রুধি) ক্ষরিত হয়। এই রস সাধকের কাছে অমৃতের সমান। এই রুধি পান করে সাধক শরীরের সমস্ত রকম ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হন। তখনি জীব শিব অর্থে শান্ত হয়ে যান।

সর্বজ্ঞ

যিনি সব কিছু জানেন ও বোঝেন অর্থাৎ সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত ও পারদর্শী তারেই আমরা সর্বজ্ঞ বলে থাকি। আমাদের জানা অথবা না জানার সমস্ত কিছুই অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই তিন কালের মধ্যে নিহিত বা ধরা। সেই কারণে আমরা সর্বজ্ঞ এবং ত্রিকালদর্শী বা ত্রিকালজয়ী পুরুষ একই অর্থে ব্যবহার করে থাকি।

প্রকৃত পক্ষে সর্বজ্ঞ অর্থে আমরা তারেই বুঝে থাকি যার জ্ঞানের পরিধি দূর থেকে বহুদূরে, যুক্তি তর্কের বাইরে পর্যন্ত বিস্তৃত। বিজ্ঞানের জানার পরিধি বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত থাকলেও তার চিন্তাভাবনার সমস্ত কিছু যুক্তি তর্কের গণ্ডীর মধ্যেই ধরা এই হিসাবে আমরা বিজ্ঞানীদেরকে সর্বজ্ঞের পর্যায়ে ফেলতে পারি না। অপরদিকে সাধক সম্প্রদায়ের চিন্তাভাবনা যুক্তি তর্কের বাইরে, অপ্রামাণ্যের মধ্যেও প্রামাণ্যকে ধরা। সেই কারণে এদেরকে সর্বজ্ঞের পর্যায়ে ফেলানো সম্ভব।

গাছ যেমন ফলের ভারে নত হয়ে যায়, অনুরূপ ভাবে যারা ঐরূপ পারদর্শিতা অর্জন করে থাকেন তারা স্বাভাবিকভাবেই নম্র ধীর স্থির শান্ত ও নীরব হয়ে যান, অহেতুক সাত পাঁচে মাথা ঘামান না। আমাদের সমাজের

সবার শেষে সৃষ্টি রহস্যের কথা, সৃষ্টিয় নিয়মেই মদখোরের সাথে মদখোর, চাষীর সাথে চাষী, চোরের সাথে জোচ্চারের এবং রাজনীতিবিদদের সাথে অন্য রাজনীতিবিদদের সখ্যতা ও বন্ধুত্ব। এই কারণেই মালীর সাথে মেছুনির সখ্যতা বিরল। কিন্তু

সবার মূলে আচার-আচারণ, উভয়ের আচরণ যদি একই রকম হয় তাহলেই বন্ধুত্ব গাঢ় হয়, নতুবা হয় না। এর পিছনে কাজ করে থাকে সৃষ্টিয় কাঠামোগত গুণ—জন্মলগ্নে চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্রাদির প্রভাব।

নিজের সন্তান সন্ততির প্রকৃত স্বভাব, আচার-আচরণাদি জানার জন্য তার সহপাঠী, বন্ধু বান্ধব যাদের সাথে দিনরাত ওঠা-বসা, গাঢ় বন্ধুত্ব তাদের স্বভাব চরিত্রাদি আড়াল থেকে লক্ষ্য করলেই জানা হয়ে যায়।

মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ সফলতা

আমাদের সমাজ ও সামাজিক জীবনে সফলতা আসে অর্থোপার্জন, যশ-মান-খ্যাতি লাভে অথবা পুত্র পরিবার পরিজন আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব নিয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করাতে—এ'টাই আমাদের সবাইকার ধারণা, কিন্তু বস্তুতপক্ষে তা নয়। যেহেতু এগুলোর কোনটাই স্থায়ী নয়, সবই অস্থায়ী, মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ সফলতা ঈশ্বর দর্শনে—এ'রূপ বক্তব্যও অনেকে রেখে থাকেন, কিন্তু বাস্তবে এ'ও ঠিক নয়। কেননা কেবল ঈশ্বর দর্শনে সৃষ্টি রহস্যের পিছনে লুকিয়ে থাকা বহুবিধ প্রশ্ন যেমন কি? কেন? কীভাবে? কোথা থেকে? —ইত্যাদির উত্তর পাওয়া যায় না, অনুপ্রেরণা পাওয়া যায় মাত্র। প্রকৃতপক্ষে মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ সফলতা আসে অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভে, যা একমাত্র সৃষ্টির গোপন রহস্য ভেদেই সম্ভব হয়, অন্য কোনও ভাবে এমনকি কেবল ঈশ্বর দর্শন বা ক্ষণিক সমাধিতেও সম্ভব হয় না। একমাত্র এই জ্ঞান লাভ করার পর সাধকের কাছে সুখ দুঃখ, আশা-নিরাশা, পাওয়া-না পাওয়া সব কিছুর মূল্য এক হয়ে যায়। সবেতেই নির্লিপ্ত ভাব, শুধু একটিই কথা—"প্রভু এই করেছো ভালো", কি "প্রভু রাখো তব চরণে"।

MUKTIR SOPAN
Religious Book
By
Pasupati Parai

প্রথম প্রকাশ : ৩০ ডিসেম্বর, ২০০৭

প্রকাশক : অমল মুখোপাধ্যায়
অরুণিমা প্রকাশনী
৯৮ই, পি. সি. বড়াল স্ট্রীট
কলকাতা - ৭০০ ০১২
মোবাইল ঃ ৯৮৩১২৭৫২৬১

মুদ্রক : বেলা দাস

মুদ্রণ : গড়ের মাঠ অফসেট
২৫, গঙ্গাধরবাবু লেন, কলকাতা-১২

অক্ষর বিন্যাস : CAYERS
১৩/২, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন
কলকাতা - ৭০০ ০১২

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
গ্রাম - জশাড়, পোঃ - শ্রীবরা
জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর
পিন - ৭২১১৩০
ফোন - ৯৭৩৪৮ ১৫৪৫০
অফিস : ২৬৫৪-৭৯০৭

পরিবেশনায় : দর্শনাচার্য ভীমানন্দ জ্ঞানপীঠের পক্ষে
সম্পাদক শ্রী নিমাই পাল
পাইকপাড়ী, কোলাঘাট, পূর্ব মেদিনীপুর
ফোন - (০৩২২৮) ২৫৬৯১১

অনুপ্রেরণায় : স্বামী সত্যানন্দ যোগাশ্রমের পক্ষে
সম্পাদক শ্রী শ্যামল কুমার বসু
পাইকপাড়ী, কোলাঘাট, পূর্ব মেদিনীপুর

মূল্য : নব্বই টাকা মাত্র

প্রচ্ছদ : জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়

নিবেদন

মুক্তির সোপান বইখানি দর্শনাচার্য ভীমানন্দ যোগী মহারাজের দর্শন ভাবনার প্রেক্ষাপটে লেখা। বইখানি লেখার ইচ্ছা ছিল বহু আগেই, গুরুদেব জীবিত থাকা অবস্থায়, কিন্তু সময়াভাবে হয়ে ওঠেনি। আজ অবসর জীবনে হাতে কিছুটা সময় পেয়ে ঐ কাজটি সম্পন্ন করতে চলেছি।

আজ বিজ্ঞানের দৌলতে আমাদের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত হয়েছে। আমাদের বাঁচার বাঁধন হয়েছে মজবুত, তবুও আমাদের নৈতিক অবনতি ঘটেছে বিপুলভাবে। আমরা পার্থিব বন্ধন ও দৈহিক আকর্ষণে সব ভুলে গেছি—আমাদের আত্মবিস্মৃতি ঘটেছে। আমরা নীতিভ্রষ্ট। আমাদের শক্তির সাথে ঐক্যে ধরেছে চিড়, এসেছে ভাঙন। আমরা একে অন্যের বিরুদ্ধে কেবলই দোষারোপ করে চলেছি, কিন্তু মূল গলদ যে অন্যত্র তা আর ধরতে পারছি না। ফলে পারস্পরিক মনের মিলে ধরেছে অনভিপ্রেত ভাঙন —যা সমাজ জীবনের উপর হেনেছে চরম আঘাত।

এই ভাঙন রোধে আমাদের দরকার সমস্ত মানুষ্যজাতিকে বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের একই মোড়কে বেঁধে দেওয়া। যে ধর্মের নামে কুসংস্কার, অজ্ঞতা, অন্ধকারিত্ব, গোঁড়ামি প্রভৃতি কিছুই থাকবে না। পরিবর্তে বলা থাকবে আমাদের দেব-দেবী, পূজা-আচ্ছার, মন্ত্র-তন্ত্রের মতো যাগযজ্ঞাদির আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা? যদি থাকে কোথায়, কীভাবে কতখানি ও কি জন্য তা আছে —অর্থাৎ কল্পনা থেকে বাস্তবতার কথা। জানানো থাকবে শিক্ষার দ্বারা আমাদের বোঝা-পড়া হয়, অর্থের দ্বারা আমাদের অভাব দূর হয়, কর্মের দ্বারা বাঁচার বাঁধন মজবুত হয়, আর ধর্মের দ্বারা মনের অশান্তি দূর হয়, মনোবল বাড়ে। আরোও বলা থাকবে কর্মরূপ ধর্মের দ্বারাই পার্থিব জগতের সমস্ত রকম সম্পদ ছাড়িয়ে অপার্থিব জগতের সম্পদ সঞ্চিত হয়। যে সম্পদের ক্ষয় নেই, মৃত্যুর পরেও সঞ্চিত থাকে ও সঙ্গে যায়।

আমাদের বিজ্ঞান এনে দেবে অধিকার, যেখানে ধর্ম শেখাবে দায়িত্ব বোধ। এই দুইয়ের পারস্পরিক ও পূর্ণাঙ্গ মিলনেই মিলবে আমাদের সমস্ত রকম জ্বালা যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি তথা মুক্তি। মুক্তির সোপান বইখানিতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারে বারে এই কথাই বলতে চাওয়া হয়েছে।

গুরুদেবের ভাব আর আমার গ্রাম্য ভাষা এই নিয়ে সহজ সরল করে সমস্ত কিছু বোঝাতে চেয়েছি, কিন্তু এ সম্পর্কীয় অন্য কোনও পুঁথি বা